মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

মোশাররফ হোসেন খান

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-842-021-5

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৪
জিলকদ ১৪২৪
পৌষ ১৪১০

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Munshi Mohammad Meherullah Written by Mosharraf Hossain Khan and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition January 2004 Price Taka 40.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

গোড়ার কথা ৫
আগুনের ফুলকি ১৬
চাঁদের মুখে কালো মেঘ ২০
সতর্ক পদক্ষেপ ২৫
গর্জে উঠলেন একজনই ২৯
সময়ের শত্রু-মিত্র ৩৩
শত্রু হলেন বন্ধু ৩৬
সেই এক মানুষ ৩৮
অসীম তাঁর ভালবাসা ৪২
দৃষ্টির সীমায় জোছনার ঢল ৪৮
সংগ্রাম ছোটে স্বপ্নের দোলায় ৫৩
মিলন মেলার সেই যে গোলাপ ৬৩
তর্ক তো নয়, নাঙ্গা তলোয়ার ৬৭
গল্পের ছলে সত্য ছোঁয়া ৭২
মেহেরউল্লাহর মজার গল্প ৭৭
সাহিত্যের সীমানায় ৮৬
ঐতিহাসিক সওয়াল-জওয়াব ৯০
কবিতার চমক ১০৭
নিদারুণ এক দণ্ডের করাত ১১৫
খড়ের নিচে হীরক খণ্ড ১২০
ডুবিলে হায়াতের বেলা ১২৪
শোক সাগরের ঢেউ ১২৬
জীবনপঞ্জি ১৩৮
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৪২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গোড়ার কথা

বৃটিশ শাসনের অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে অশান্তির দাবানল তখনো জ্বলছে।

তাদের কালো থাবায় বাংলার মানুষের জীবন ক্ষত-বিক্ষত।

চারদিকে ভাঙনের ঘনঘটা।

হতাশার ঢলে ভাসমান অসহায় বাংলার মানুষ।

১৮৫৭ সন। গৃহীত হলো সিপাহী যুদ্ধের শেষ সিদ্ধান্ত।

দিশেহারা বাংলার মুসলমান। সর্বস্বান্ত হয়েছে তারা বৃটিশ শোষকের শিকার হয়ে। তারা পর্যুদস্ত।

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বৃটিশের চক্রান্ত প্রতিরোধে অক্ষম হলো। হাজী শরীয়তুল্লাহ আর দুদু মিয়া অন্তিম শয়ানে শায়িত।

ওদিকে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীও ব্যর্থ হচ্ছেন বার বার।

অশান্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় তাঁরাও দিশেহারা।

মুসলিম জাতি এই বাংলার ভূখণ্ডে তখন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। তারা ছিল মুক্তির জন্যে পাগলপারা।

শেকল পরা জাতির সামনে একবিন্দু আশার আলোক শিখা নিয়ে কেই বা আর সামনে আসে?

এসব ভেবে তারা ছিল আতংকিত।

এই ছিল মুনশী মেহেরউল্লাহর জন্মের কিছু আগেকার দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি, চালচিত্র।

মুনশী মেহেরউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬৮ সনের ১০ই পৌষ, সোমবার। ইংরেজী ১৮৬১।

www.pathagar.com

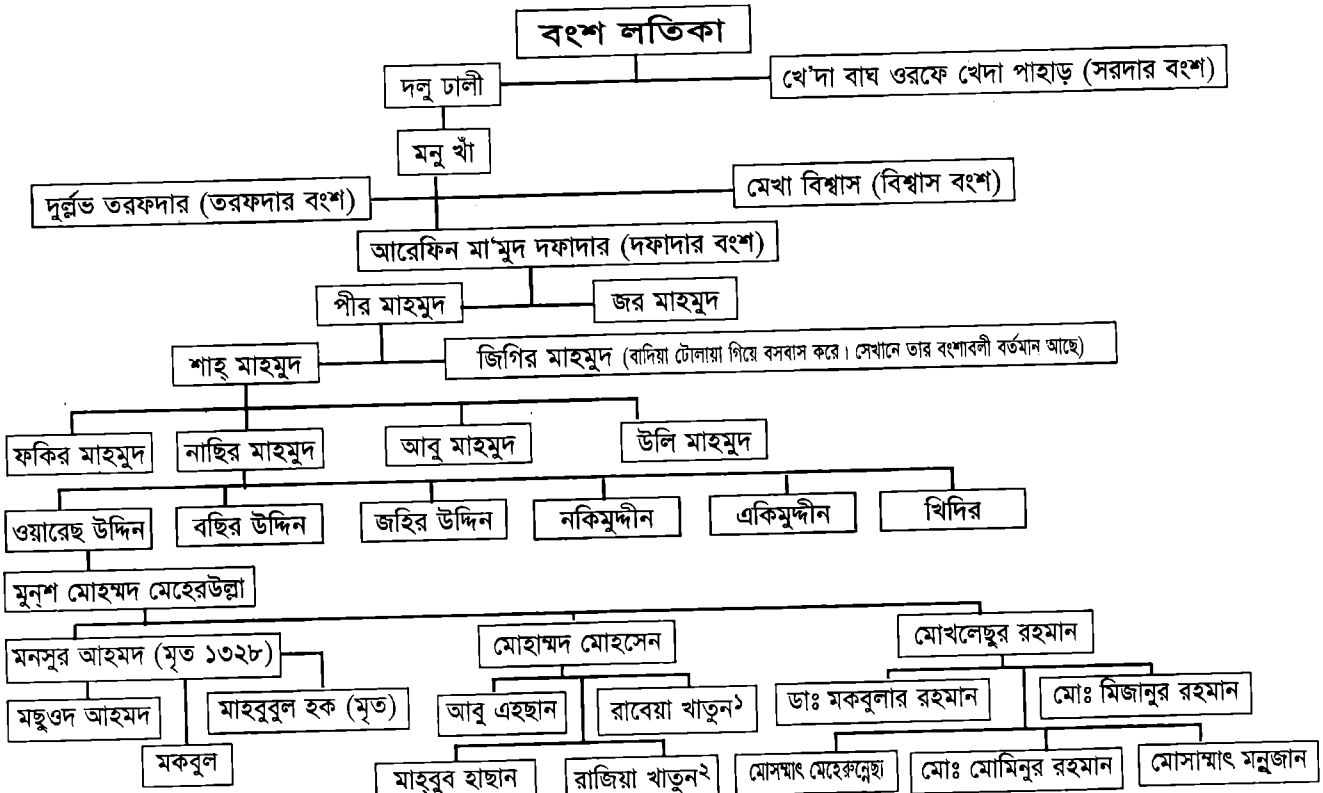

১. রাবেয়া খাতুনের নামে চট্টগ্রামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে– রাবেয়া রহমান লেন।

২. মুন্শী মেহেরউল্লা'র এই দৌহীত্রির স্বামী হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ, বাদশাহ্ ফয়সল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম বাঙালী, অধ্যাপক ড. মেহার আলী।

www.pathagar.com

তাঁর মাতুলালয়ে যশোর জেলার 'ঘোপ' নামক গ্রামে।

পিতা ওয়ারেস উদ্দীন ছিলেন মধ্যবর্তী শ্রেণীর ধনী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। ইসলামের মহোত্তম ছাঁচে তাই গড়তে চেয়েছিলেন পুত্র মেহেরউল্লাহকে।

বালক মেহেরউল্লাহকে ভর্তি করে দিলেন স্থানীয় ছাতিয়ানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

মেহেরউল্লাহ এই বিদ্যালয়ে গভীর মনোযোগের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।

মূলত 'বাংলাই' ছিল এখানকার শিক্ষার মাধ্যম।

মেহেরউল্লাহ চেয়েছিলেন লেখাপড়ার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাবেন অনেক দূর। কিন্তু পারলেন না তিনি। থমকে দাঁড়াতে হলো মাঝপথে।

কারণ এই সময় ইন্তিকাল করলেন পিতা ওয়ারেস উদ্দীন।

শিশু মেহেরউল্লাহ হলেন শোকের স্রোতবাহী সাগরের একজন ভাসমান নাবিক।

এ যেন অকাল এক ঘনঘটা, বজ্রধ্বনি। এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল তাঁর শিশু জীবনে।

পিতার ইন্তিকালের পর সংসারে নেমে এলো চরম দুঃখ-দুর্দশা। অভাব হলো তাঁদের নিত্যসংগী।

মায়ের তবু অদম্য ইচ্ছা ছেলেকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলবেন। সাধ আছে, সাধ্যের অভাব। বাধ্য হয়ে নিজের ভাইদের সহযোগিতা কামনা করলেন মহীয়সী মাতা। তাঁর প্রচেষ্টা বিফলে গেল না।

মেহেরউল্লাহ মামাদের আর্থিক আনুকুল্যে আর মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় আবারো শিক্ষালাভে ব্রতী হন।

এবার শুধু বাংলা নয়– পাঠ করতে লাগলেন আরবী, উর্দূ, ফারসী ও পুঁথিপত্র।

কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন প্রচলিত নিয়মে পাঠশালার শিক্ষা লাভে। চরম দুর্যোগের মুকাবিলায় পরাজিত হলেন তিনি।

www.pathagar.com

প্রয়োজন দেখা দিলো উপার্জনের।

যে বয়সে ছেলেরা খেলা আর পাঠশালার পড়ায় মগ্ন থাকে, যে বয়সে রঙিন স্বপ্নের জোয়ারে ভেসে যায় উচ্ছল মন-প্রাণ– ঠিক সেই বয়সেই মেহেরউল্লাহকে কাজের সন্ধানে বেরুতে হয়। বেঁচে থাকার জন্যে ভীষণ প্রয়োজন তাঁর রোজগারের।

তিনি চাকরি নিলেন যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে।

বয়স তখন কতইবা। উনিশ কি বিশ বছর।

বেশ কিছু দিন এখানে কাজ করলেন।

কিন্তু মনটা তাঁর বড়ই অশান্ত, চঞ্চল। উড়ন্ত পাখির মতো কেবলই ছুটে যেতে চায় দূরে, বহুদূরে।

স্বাধীনচেতা যুবক মেহেরউল্লাহ।

চাকরিকে তিনি সহজভাবে বরণ করে নিতে পারেননি। অবশেষে চাকরি ছাড়লেন। ঠিক করলেন ব্যবসা করবেন।

বর্তমান সুন্দর ঝলমলে শহরের মতো তখনকার যশোর শহরটা এতো পরিপাটি ছিল না। দড়াটানা এখানকার প্রসিদ্ধ এবং বহুল পরিচিত একটি স্থান। এই দড়াটানার একপাশেই ছোট্ট একটি দোকান ঘর বানালেন মেহেরউল্লাহ। শুরু করলেন দর্জির কাজ।

সৎ, ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে মুহূর্তেই পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। খরিদ্দার বাড়তে থাকলো। ব্যবসারও উন্নতি হচ্ছে দ্রুত গতিতে।

তাঁর সুনাম সুযশের সৌরভে তখনকার জেলা জজ পর্যন্তও কাজ করাতেন এখানে।

দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ চরিত্র গুণে মেহেরউল্লাহ সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন প্রিয়, আস্থাবান।

কর্মজীবনের শুরুতেই মেহেরউল্লাহর জ্ঞানপিপাসা আরও বেড়ে যায়। অধিক পড়ার ফলে তাঁর চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটে। অর্জন করেন সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মতো সুন্দর-সুস্থ বিবেক বুদ্ধি।

www.pathagar.com

সময়টা ছিলো খৃস্টান মিশনারীদের অগ্রপ্রচারের যুগ।

যশোর শহরে চলে খৃস্টানদের অশুভ পাঁয়তারা। ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা বিভ্রান্ত করে সরলমনা মুসলমানকে।

তাদের ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে তারা তৎপরতা চালায়।

বুকলেট, লিফলেট প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে খৃস্টান পাদ্রী ও মিশনারীরা কাজ করে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

তাদেরকে বাধা দেবার মত কেউ নেই। কেউ পারে না প্রতিহত করতে।

এসব দেখেন মেহেরউল্লাহ। দেখেন তাদের কুটিল ষড়যন্ত্র। শোনেন, মুসলমান ভাইদের পদস্খলনের কথা। খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা নেবার কথা। শুনে ভারী হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়। কেঁদে ওঠে তাঁর সত্য বিবেক।

ভাবতে থাকেন, প্রতিকারের উপায় কি?

ঠিক এই সময়ই মেহেরউল্লাহর হাতে আসে দু'খানা পুস্তিকা। প্রথমটি হাফেয নিয়ামাতুল্লাহকৃত 'খৃস্টান ধর্মের অসারতা'। আর দ্বিতীয়টি বাবু ঈশান চন্দ্র ওরফে মৌলভী এহসান উল্লাহকৃত 'ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর খবর আছে'।

এই দুটো পুস্তিকা পড়ে অভিভূত হলেন মেহেরউল্লাহ।

খুলে গেল তাঁর বোধের দরজা। বুঝতে পারলেন খৃস্ট ধর্মের অসারতা কোথায়।

এবার তিনি আরও শক্তি অর্জন করলেন মনের দিক দিয়ে। আরও সোচ্চার হলো তাঁর চেতনার রাজ্য। গর্জে উঠলেন তিনি। গর্জে উঠলো মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদী আত্মা।

দর্জির দোকানে খরিদ্দারের ঢল নামে। জমজমাট ব্যবসা। অর্থ উপার্জনের মোক্ষম সময়।

কিন্তু না, মেহেরউল্লাহর কাছে এ মুহূর্তে অর্থটা গৌণ হয়ে দেখা দিলো। মুখ্য হলো ইসলামকে সুদৃঢ় করার চিন্তা।

মুসলমানকে খৃস্টান পাদ্রীদের ছোবল থেকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি হয়ে উঠলেন দারুণ ব্যস্ত।

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী সাহসী সৈনিক মুনশী মেহেরউল্লাহ এবার ঘর থেকে বের হলেন বাগ্মির ভূমিকায়।

দোকানের সামনে দড়াটানার মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন তিনি।

ডাকেন দু'হাত উঁচু করে মুসলিম জনতাকে।

বুঝান ইসলামের শাশ্বত বিধান। বুঝান তিনি সরল ব্যাখ্যায়, দৃঢ় কণ্ঠে খৃস্ট ধর্মের অসারতা।

মোহিত হয় শ্রোতারা। বুঝতে চেষ্টা করে তারা সত্য দ্বীনকে।

অপরদিকে শত্রু খৃস্টান পাদ্রীদেরকেও তারা চিনতে শেখে।

মেহেরউল্লাহর স্পষ্ট বক্তৃতায় আশ্চর্য হয়ে যায় পথিক, হাঁটুরে, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা।

থমকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয় তারা।

ক্রমান্বয়ে জনঢলে পূর্ণ হয় মেহেরউল্লাহর বক্তৃতার আসর।

দ্রুত, খুব দ্রুত মেহেরউল্লাহ মানুষের কাছে মুনশী মেহেরউল্লাহ, বাগ্মী মেহেরউল্লাহ, ইসলাম প্রচারক মেহেরউল্লাহ নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এবার শুধু দড়াটানা আর যশোর শহরেই নয়। আশপাশ গ্রামগঞ্জে গিয়ে তিনি সভা করতে থাকেন।

খৃস্টান পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় বক্তৃতার বান ছোড়েন।

খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতভাগ্য মুসলমান আবারো ফিরে আসতে শুরু করেছে ইসলামের দিকে। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল। সে ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তারা আল্লাহর কাছে তওবা করছে।

এসব জেনে পাদ্রীরা হতচকিত।

মেহেরউল্লাহর তৎপরতায় তারা ভীত হয়ে উঠলো।

সংকুচিত হতে থাকলো তাদের সাহসের নদী।

সৈনিক মেহেরউল্লাহ জিহাদের তেজে দীপ্তিমান! দ্বিগুণ সাহসের সাথে মুকাবিলা করতে থাকলেন পাদ্রীদের।

www.pathagar.com

তারা যেখানেই সভা করে, তার পাশেই আরেকটা বিশাল জনসভা গড়ে ওঠে মেহেরউল্লাহর।

দলে দলে লোক জমায়েত হয় সে সভায়।

পণ্ড হয়ে যায় পাদ্রীদের তাবৎ শ্রম, চেষ্টা আর কুটিল ষড়যন্ত্র।

মেহের!

আল্লাহরই পাগল মুনশী মেহেরউল্লাহ।

কে রুখবে তাঁকে?

"ইসলাম প্রচারক"-এর সেই উক্তিটিও এসে যায় জিহ্বার ডগায় :

"যশোর জিলার খৃস্টীয়ান প্রচাকরগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহুকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ও মুনশী মোহাম্মদ কাশেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবের কঠোর উদ্যোগে খৃস্টীয়ানগণের উদ্যম নিষ্ফল হইয়াছে।"

[ইসলাম প্রচারক : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮/১৮৯১ইং]

মুনশী মেহেরউল্লাহর বয়স তখন ত্রিশ বছরের মতো।

পাদ্রীরা শিক্ষিত বুদ্ধিমান এবং ভীষণ চতুর।

তারা একাধারে বাগ্মী, ভালো লেখক ও সকল বিষয়ে দক্ষ ও কর্মঠ।

মেহেরউল্লাহ ভাবলেন শুধু বক্তৃতাতে কাজ হবে না। পাদ্রীদের মুকাবিলা করতে হলে লেখনীরও প্রয়োজন।

সুতরাং বক্তৃতার পাশাপাশি লেখনীও শুরু করলেন সচেতন মুনশী মেহেরউল্লাহ।

লেখার জন্য প্রয়োজন সুস্থ বিবেক, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কঠোর অনুশীলনের। মুনশী মেহেরউল্লাহ এদিকে দৃষ্টি দিলেন তীক্ষ্ণভাবে। পড়তে থাকলেন গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের পাশাপাশি বেদ, পুরান, বাইবেল, ত্রিপিটক প্রভৃতি গ্রন্থ।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চললেন তিনি দুর্বার গতিতে।

www.pathagar.com

এগুতে গিয়ে কখনও বাগ্মী, কখনও লেখক আবার কখনও বা একজন একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে যান তিনি।

মেহেরউল্লাহর একান্ত সহচর, যোগ্য জিহাদী ভাই জমিরুদ্দীনের একটি মন্তব্য এখনো দোলা দিয়ে যায় হৃদয়ে। তিনি বলেন :

"প্রথম জীবনে তিনি যে সামান্য উর্দূ ও ফারসী শিখেছিলেন প্রচারক জীবনে তা বিশেষ কাজে আসে। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এতোই প্রবল ছিলো যে, দর্জির দোকানে শিক্ষানবিস কালেও তিনি অবসর সময়ে জনৈক তাজ মাহমুদের নিকট উর্দূ পড়তেন ও উর্দূ সাহিত্যের চর্চা করতেন। স্থানীয় সাহিত্য রসপিপাসু অনেক ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সাহিত্য আসরে হাজির হতেন। এভাবে দড়াটানার এই ক্ষুদ্র দর্জি দোকানটি রীতিমতো সাহিত্য ও ধর্ম আলোচনার আড্ডায় পরিণত হয়।"

অল্পদিনের মধ্যে মুনশী মেহেরউল্লাহ সাহিত্যিক মেহেরউল্লাহ হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠেন।

লিখতে থাকেন। তাঁর কলম চলে যুদ্ধের তেজী ঘোড়া মতো।

সে কলমের ছোঁয়ায় আগুন জ্বলে ওঠে পাদ্রীদের বুকে।

মুমিনের বুকে জাগে স্বপ্ন, জাগে সাহসের অযুত সেনা।

প্রকাশ করলেন তিনি 'খৃস্টীয় ধর্মের অসরতা'। গ্রন্থখানি প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই [১২৯৩/১৮৮৬ প্রকাশকাল] পাঠকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে পাদ্রীদের মুকাবিলায়।

স্রোতের গতির মতো কলম চলে মুনশী মেহেরউল্লাহর।

একে একে লিখলেন তিনি "মেহেরুল ইসলাম" [১৮৯৫], "বিধবা গঞ্জনা" [১৮৯৭], "জওয়াবুন নাছারা" [১৮৯৮], "নূরুল ইসলাম" [১৯০১], "হিন্দু ধর্ম রহস্য" নামক গ্রন্থ।

মাত্র কয়েক বছরে অত্যন্ত মূল্যবান এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয়।

মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন তখনকার দিনে এক বিরল প্রতিভা, অনন্য, অসাধারণ।

www.pathagar.com

তাঁর লেখা পাঠকের মনে বিঁধে যেত তীব্র গতিতে। তারা আরও সোৎসাহে এগিয়ে আসতো ইসলামের পথে।

আর ওদিকে পাদ্রীদের বুকে শেলের মতো বিদ্ধ হতো মেহেরউল্লাহর তৎপরতা।

মুনশী মেহেরউল্লাহ শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না। তিনি সাহিত্য সংগঠকও ছিলেন।

তিনি মনে করতেন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সৃষ্টি ছাড়া মুসলমানদের জাগানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় পাদ্রীদের মুকাবিলা করা। তিনি এই বিশ্বাসে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সফল হলেন এখানেও। গঠন করলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টি করলেন নতুন লেখক ও সাহিত্যিক।

এ প্রসঙ্গে জনৈক লেখক বলেন :

"সত্যি কথা বলতে কি, সেকালে মুসলিম তরুণ সাহিত্য ও সমাজসেবী দলই ছিলেন মুনশী সাহেবের সৃষ্টি ও পরিবৃদ্ধি। এছাড়া সাংবাদিকতায়ও মুনশী সাহেবের আগ্রহের সীমা ছিলো না। তিনি মুসলিম সমাজ জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে সাংবাদিকতার ও সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং তিনি সমাজকে সাংবাদিকতার কাজে প্রলুব্ধ করেন।"

অন্য আর এক প্রখ্যাত গবেষক ও সাহিত্যিকের ভাষায় :

"তিনি নিজে সাংবাদিক ছিলেন না, কিন্তু মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসেও মুনশী সাহেবের অগ্রণীয় ভূমিকা ছিলো। ১২৯৮ সালে অনুষ্ঠিত পিরোজপুরের খৃস্টান মুসলমানের তর্কযুদ্ধে মুনশী সাহেব 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিনিধি বা প্রচারক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন... মিহির ও সুধাকরের জন্যে তিনি বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতেন। ...সুধাকরের পৃষ্ঠাতেই তিনি সমকালীন দুর্ধর্ষ পাদ্রী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠকরত্নের সার্থকভাবে মুকাবিলা করে তাঁকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।"

www.pathagar.com

[মুনশী মেহেরউল্লাহ, মুহম্মদ আবু তালিব, পৃঃ ৩১]

চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল ইসলামী জীবন-চরিত্রের মানুষ, আল্লাহ এবং রাসূলই [সা] ছিলেন তাঁর জীবনাদর্শের মৌল সূত্র। তিনি বাস্তব জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

এই ছিল মুনশী মেহেরউল্লাহর চরিত্র। যে চরিত্রের পথ প্রদর্শক ছিলেন নবী মুহাম্মাদ [সা] এবং সাহাবায়ে কিরাম [রা]।

মুনশী মেহেরউল্লাহর মতো চরিত্র বাংলার ইতিহাসে বড়ই বিরল।

তিনি একাধারে সমাজসংস্কারক, ইসলাম প্রচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ, বাগ্মী, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক।

অপরদিকে বন্ধুবৎসল, দায়িত্বশীল সংসারী, একনিষ্ঠ দ্বীনী ব্যক্তিত্ব।

উন্নত এবং সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব আবার মিথ্যার বিরুদ্ধে ছিলেন অসীম সাহসী।

সেখানে তিনি আপোষহীন এক সংগ্রামী মুজাহিদ।

মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন সেই সময়ের একজন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মানুষ।

ইসলামী জাগরণের সংগ্রামী এই সিপাহসালার, মুনশী মেহেরউল্লাহ ইন্তিকাল করেন ১৩১৪ [১৯০৭] সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ।

তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর।

যশোর জেলার নিজ বাসভূমি ছাতিয়ানতলা [বর্তমান মেহেরউল্লাহ নগরীতে] ঘুমিয়ে আছেন মুনশী মেহেরউল্লাহ।

না ঘুমিয়ে নয়, বরং প্রচণ্ড উজ্জ্বলতায় জেগে আছেন বাংলার ইতিহাসের প্রদীপ্ত এক নক্ষত্র– মুনশী মেহেরউল্লাহ।

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

আগুনের ফুলকি

মুনশী মেহেরউল্লাহ।

কি বিস্ময়কর এক নাম! নাম তো নয় যেন পর্বতের চূড়া। মানুষ তো নয় যেন আগুনের ফুলকি।

সত্যিই আগুনের ফুলকি। জ্বলে উঠেছিলেন যিনি পরবর্তীতে, ধীরে ধীরে, সম্পূর্ণভাবে।

আমরা আগেই জেনেছি, মেহেরউল্লাহ জন্মেছিলেন যশোর শহর সংলগ্ন 'ঘোপ' নামক গ্রামে।

'ঘোপ' তখন ছিল একটি সাধারণ গ্রাম। আর এখন সেটি যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র। কালে কালে, মেহেরউল্লাহর জন্মের কারণেই জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

আল ছাতিয়ানতলা!

'ছাতিয়ানতলা'। নামটি শুনতেই যেন কেমন লাগে।

গ্রামটির এই নাম করণের পিছনেও একটি চমৎকার কারণ আছে। আর সেটি হলো, এই গ্রাম তো আর আগের দিনে এমনটি ছিল না।

ছিল ঘন জঙ্গল আর জনশূন্য প্রায় এক নির্জন ভূতুড়ে স্থান।

গা ছম ছম করা এক জায়গা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এখানেই একটি গাছ ছিল। বিরাট এক গাছ। গাছটির নাম– ছাতিয়ান।

কালে এই গাছটির নামানুসারেই গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে উঠলো।

এখন তো ছাতিয়ানতলা বলতে সবাই এক বাক্যে চিনে ফেলে।

চিনবে না কেন? গ্রামটির সাথে যে এক কালের শিশু– পরবর্তীকালের বিখ্যাত একজন মনীষীর নাম যুক্ত হয়ে আছে। সেই বিখ্যাত মানুষটির নাম মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

www.pathagar.com

তাঁর পিতা মুনশী ওয়ারেস উদ্দীন বাস করতেন সেই ছাতিয়ানতলা গ্রামে। যশোর শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল।

ওয়ারেস উদ্দীন যখন শুনলেন তার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তখন তিনি কি যে খুশি হলেন! বুকটা তার ভরে উঠলো আনন্দে। হৃদয়ব্যাপী কেবল জোসনার নাচানাচি। দু'হাত তুলে তিনি জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে অশেষ শুকরিয়া।

দিন যায়, রাত যায়। প্রতীক্ষার কাল যেন আর কাটতে চায় না। অধীর হয়ে ওঠেন ওয়ারেস উদ্দীন। কবে নিজের ঘরে উঠে আসবে চাঁদ সওদাগর, সোনার রাজপুত্র! কবে?

অপেক্ষার পালা শেষ। মেহেরউল্লাহর বয়স তখন মাত্র ছয় মাস। ওয়ারেস উদ্দীন মমতার বাতাসে ভাসিয়ে তার কলিজার টুকরাকে 'ঘোপ' থেকে নিয়ে এলেন আপন বাড়িতে। ছাতিয়ানতলায়।

নিভৃত একটি গ্রাম– ছাতিয়ানতলা।

পাখি ডাকে। বাতাস বয়। চারপাশে প্রকৃতির হাতছানি। সবুজ আর সবুজ।

মাঠের পর মাঠ ফসলের ক্ষেত।

সেই এক মনোরম পরিবেশ।

প্রকৃতির খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢোকে।

ঘরে ঢোকে সূর্যের অফুরন্ত আলো।

এই আলো-বাতাসে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে একটি শিশু।

শিশু তো নয়, যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। মুনশী মেহেরউল্লাহ।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর সম্পর্কে তারই নিত্য-সহচর, বন্ধুপ্রতীম মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন কাব্য-বিনোদ লিখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। এই গ্রন্থে মেহেরউল্লাহর অন্যান্য প্রসঙ্গ তো আছেই, সেই সাথে আছে তার জন্মের কথাও।

মুনশী জমিরুদ্দীন পরে আরও বিস্তৃত করে লিখেছিলেন 'মেহের চরিত'। সনটি ছিল ১৩১৫, ইং ১৯০৮।

www.pathagar.com

এখান থেকে বহু বছর আগের কথা। সুতরাং তার লেখাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মূল্যবান। মেহেরউল্লাহ সম্পর্কে আমরা জমিরুদ্দীনের সেই লেখার কিছু অংশের সাথে এখন পরিচিত হবো। জমিরুদ্দীন লিখছেন :

"যিনি বংগীয় মুসলমান সমাজে সভা সমিতি অধিবেশনের সূত্রপাত করিয়েছেন, যিনি খ্রিস্টীয় ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়া, পাদ্রী ও খৃস্টানদিগের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়াছেন যিনি ইসলাম-ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; সেই মোসলেম কুলরত্ন, বাগ্মীকুল-তিলক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, সোমবার দিবাগত রজনীতে, যশোহর জেলার অন্তর্গত "ঘোপ" নামক গ্রামে, তাঁহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ছয়মাস হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত ছাতিয়ানতলায় আনীত হন। যশোহরের উত্তর পশ্চিম কোণে– প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা নামক ক্ষুদ্র পল্লীটি অবস্থিত। মুনশী সাহেব মরহুমের মুখে শুনিয়াছি, এখন যে স্থানে ছাতিয়ানতলা নামক পল্লী বর্তমান, পূর্বে উহা জনশূন্য ছিল। একটি ছাতিয়ান বৃক্ষ– ব্যতীত তথায় আর কিছুই নয়নগোচর হইত না। মুনশী সাহেবের পূর্বপুরুষ খাঁ উপাধীধারী কোন পাঠান, সর্বপ্রথম গৃহ নির্মাণ করিয়া এইস্থানে বসবাস করেন। ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে উহা একটি গণ্ড গ্রামে পরিণত হইয়াছে। মুনশী সাহেবের পিতার নাম মুনশী মোহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দীন মরহুম সাহেব। তিনি নেকবখত ও পরহেযগার লোক ছিলেন। মুনশী সাহেবের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষার্থে পাঠশালায় প্রেরণ করেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ শেষ করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অতিশয় আনন্দিত হন। বোধোদয় পর্যন্ত পড়া হইলে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। এই সময়ে মুনশী সাহেবের জননী একটি পুত্র ও কয়েকটি নাবালিকা কন্যা লইয়া অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন; একে মহাজনের ঋণ তদুপরি সংসারের অভাব ও অনটনে তিনি চতুর্দিকে

www.pathagar.com

অন্ধকার দেখিতে থাকেন! কিন্তু মুনশী সাহেবের মাতুলদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল বলিয়া তাহারা বিশেষ সাহায্য করিতেন।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর উর্ধতন সাত পুরুষের বাস এই বিখ্যাত ছাতিয়ানতলায়। সেই মোঘল শাস্নের আমলের শেষের দিকের কথা। এই সময় মেহেরউল্লাহর পূর্বপুরুষ মুনায়েম খাঁ ওরফে মনু খাঁ সর্বপ্রথমে এই গ্রামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এরপর থেকে এই পরিবারটির শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়ে নেমে আসে বহুদূরে। যেমন, মুনায়েম খাঁ (ওরফে মনু খাঁ) থেকে দুলায়ের খাঁ, তার থেকে আকেল সামুদ খাঁ, তার থেকে শাহ মাহমুদ খাঁ, তার থেকে নাসির মাসুদ, তার থেকে মেহেরউল্লাহর পিতা ওয়ারেস উদ্দীন, ওয়ারেস উদ্দীন থেকে মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। আর মেহেরউল্লাহ থেকে যথাক্রমে আবুল মনসুর, মোহাম্মদ মোহসেন, মোখলেস, সালেহা খাতুন, আমিনা খাতুন, হাফিজা প্রমুখ আলোকিত করে তোলেন গ্রামটি।

তাঁদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ছাতিয়ানতলার সবুজ প্রাঙ্গণ। ছোট্ট এক আগুনের ফুলকি, সেই ফুলকি অর্থাৎ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

কালে কালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন এক মহামহীরুহ।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর জন্মস্থান ও জন্ম ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার আমরা জানলাম। এবার মেহেরউল্লাহ কিভাবে ধীরে ধীরে বড় হয়েছিলেন, কিভাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, সেকথাও আমরা ক্রমান্বয়ে জানতে পারবো।

www.pathagar.com

চাঁদের মুখে কালো মেঘ

হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড় হচ্ছে একটি শিশু। মেহেরউল্লাহ। যেন একটি পূর্ণিমার চাঁদ। ওয়ারেস উদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সৎ ব্যক্তি। তিনি বুঝতেন শিক্ষার কি মূল্য এবং মর্ম।

তিনি অপেক্ষায় থাকেন, কবে তাঁর চাঁদ সওদাগর বড় হবে। আর কবে তাকে পাঠাতে পারবেন বিদ্যালয়ে।

অপেক্ষার পালা শেষ। একদিন সত্যিই মেহেরউল্লাহকে তাঁর পিতা ভর্তি করে দিলেন কাছের পাঠশালায়।

মেহেরউল্লাহর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

এখনকার মত তখনকার দিনে ছিল না বেশি বিদ্যালয়।

তবুও কি আর করা! ছেলেকে তো আর মূর্খ রাখা চলে না। চলে না তাকে অন্ধকারে রাখা। সুতরাং পাশের হিন্দুদের একটি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন মেহেরউল্লাহকে।

শুরু হলো মেহেরউল্লাহর লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। এখানেই তিনি শেষ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। তাঁর তৃতীয় পাঠ্য পুস্তক ছিল বিদ্যাসাগর রচিত 'বোধোদয়'।

কিন্তু আফসোস!

'বোধোদয়' পুস্তক পাঠের আগেই মেহেরউল্লাহর পিতা মুনশী ওয়ারেস উদ্দীন ইন্তেকাল করলেন।

পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে যেন একটি জোছনা প্লাবিত রাতে, হঠাৎ করেই একখণ্ড মেঘ এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো পূর্ণিমার চাঁদের মুখে।

আর তখন।– তখনই কেমন যেন গা ছম ছম করা এক আশ্চর্য অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক।

www.pathagar.com

মেহেরউল্লাহ, ছোট্ট একটি শিশু।

পিতার মৃত্যুতে যে শিশু শোকের তাপও ঠিক সেইভাবে অনুভব করতে পারে না। এমনি এক দুর্যোগের সময়ে চলে গেলেন পিতা। যখন তার সামনে পড়ে রয়েছে এক দীর্ঘ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

পিতার মৃত্যুতে থমকে গেলো এই পরিবারটির অগ্রযাত্রার চাকা।

সংসারের অবস্থা ভাল না। ফলে বন্ধ হয়ে গেল মেহেরউল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার সুযোগ।

শুধু তার স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হলো না, সেই সাথে অবর্ণনীয় এক দুঃখ কষ্টে পতিত হলো পরিবারটি।

একমাত্র আয়ের উৎস ছিলেন ওয়ারেস উদ্দীন।

তাঁর মৃত্যুতে আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে উঠে গেল সংসারের সুখ। হারিয়ে গেল সকল আনন্দ আর খুশির পায়রা।

যে পরিবারে এতদিন ঘুরঘুর করতো মহাসুখের শীতল বাতাস, মুহূর্তেই সেই পরিবারে নেমে এলো অভাব, কষ্ট আর দুঃখ দুর্দশার এক বিশাল পাথর।

পিতার মৃত্যুতে মেহেরউল্লাহর আম্মাও চোখে অন্ধকার দেখলেন।

কি করবেন তিনি এখন?

মেহেরউল্লাহ ছাড়াও রয়েছে তার তিনটি নাবালিকা কন্যা।

বেশ বড় সংসার। আয় নেই। কিভাবে চালাবেন তিনি সামনের দিনগুলি?

ভেবে অস্থির হন আম্মা।

তবুও ভেঙে পড়েন না তিনি।

ভাঙবেন কেন? তিনি তো আর যেন তেন মানুষের আম্মা নন। মেহেরউল্লাহর আম্মা। যে মা এমন সন্তানকে ধারণ করেন, সেই মাকেও যে হতে হয় অনেক বড়, অনেক শক্ত এবং অনেক ধৈর্যশীলা!

মেহেরউল্লাহর আম্মাও ছিলেন শক্ত মনের মানুষ। তিনি কষ্ট পেলেন ঠিকই। কিন্তু ভেঙে পড়লেন না।

www.pathagar.com

মেহেরউল্লাহর মামাদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। সেই দুর্দিনে তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

কিন্তু তবুও। তবুও তো সাহায্যের ওপর কিছুতেই নির্ভর করা চলে না। কেননা তাতে করে আত্মমর্যাদা আর বেড়ে ওঠার মত সাহসটুকু অবশিষ্ট থাকে না।

এসব বোঝেন তার আম্মা! সেই সাথে ভাবেন একমাত্র পুত্রের লেখাপড়ার কথাও।

ভাববেন না কেন? তিনিও তো ছিলেন এক মহীয়সী মাতা।

আম্মার ইচ্ছায় আর মামাদের সহযোগিতায় মেহেরউল্লাহর আবারও শিক্ষা জীবন শুরু হলো।

এবার আর বাংলা নয়। মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে কুরআনুল কারীম পড়া শিখলেন।

শিখলেন কিছু উর্দূ ও ফারসীও। ফারসী পুঁথিপত্র বিশেষ করে শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ-বুস্তাঁ এবং পান্দেনামাও পড়লেন।

এ সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ ইসমাঈল। তাঁর বাড়ি ছিল যশোর জেলার কর্চিয়া।

এছাড়া কয়ালখালী নিবাসী মুনশী মোসহাবউদ্দীনের কাছেও তিনি সামান্য কিছু উর্দূ শিখেছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদূর এগুতে না পারলেও মেহেরউল্লাহ তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও।

তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন প্রকৃতি থেকে, পরিবেশ থেকে এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে।

মেহেরউল্লাহ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ইচ্ছাশক্তি থাকলে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকলে কোনো বাধাই কাউকে রুখতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমনটি পাননি মেহেরউল্লাহ। কিন্তু তাতে কি? তিনি যে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী তার প্রমাণ রেখে গেছেন তাঁর বক্তৃতায়, লেখায় এবং অসম্ভব ক্ষুরধার যুক্তিতে।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, যিনি ছিলেন মেহেরউল্লাহর একান্ত বন্ধু, তিনি এ প্রসংগে বলেছেন :

"মুনশী সাহেবের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, 'আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।' তাঁহার জননী ছিলেন অতি সতী সাধ্বী, বিদানুরাগিনী আদর্শ মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যশোহরস্থ কর্চিয়া নিবাসী শ্রী যুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের নিকট তিনি কুরআন শরীফ, শেখ সাদীর গোলেস্তাঁ-বোস্তাঁ ও কিঞ্চিত উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। পরে সংসারের অভাব ও অনটনে পড়িয়া মোহাম্মদ আছগর মিয়ার সহিত যশোহরে যাইয়া সেলাই শিক্ষা করেন। অল্পদিনের মধ্যে সেলাই শিক্ষা করিয়া সাহেবদিগের চাকুরী গ্রহণ করেন; পরে স্বাধীনভাবে যশোহরে একখানি সেলাইয়ের দোকান খুলেন। কর্ম করিবার সময়ে তিনি সাহেবদিগের সহিত দার্জিলিং-এ গমন করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি যশোহরে দোকান করেন; তৎকালে তথায় খ্রিস্টান মিশনারীদিগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অনেকগুলি কারিগর এই সময়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া, বাইবেল ও খ্রিস্টান ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খ্রিস্টান ধর্মে তাঁহার আস্থা জন্মে। কিন্তু তিনি বাপ্তাইজ হইয়াছিলেন না। আজকাল বাপ্তাইজ হইবেন, এমনি সময়ে হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেবকৃত "খ্রিস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা" ও বাবু ঈশান চন্দ্র মণ্ডল ওরফে এহসানুল্লা সাহেব কৃত "ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মাদের [সা] খবর আছে" নামক পুস্তক দুইখানি তাঁহার হস্তগত হয়। এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া খ্রিস্টান ধর্মে অবিশ্বাস ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। এই সময়ে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে তিনি "খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করেন ও যশোহর হাটে দণ্ডায়মান হইয়া খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি প্রচারার্থে হাটের মধ্যে দণ্ডায়মান হইতেন পাদ্রীদিগের নিকটে একটি লোকও থাকিত না। হায়! তখন কে জানিত যে, এই যুবকের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এক সময় সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইবেন; তাঁহার মধুর ওয়াজ শুনিয়া শ্রোতাগণ জীবন সার্থক করিবেন। অতঃপর তিনি যশোহরে "ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা" আঞ্জুমান স্থাপন করেন। এই আঞ্জুমানের অধিবেশনকালে একবার তিনি কলিকাতা হইতে মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মৌলবী মেরাজ উদ্দীন আহমদ সাহেব ও মুনশী শেখ আবদুর রহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যশোহরে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু পূর্বে "সুধাকর" সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হয়। সুধাকর বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে মৌলবী মোরাজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের সাহায্যে মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব ও মুনশী শেখ আবদুর রহিম সাহেব "এসলাম তত্ত্ব", "হযরত মোহাম্মদের জীবনী" ও "তোহফাতুল মোসলেমীন" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুনশী সাহেব দার্জিলিং থাকাকালীন একজন মুসলমান সওদাগর "মনসুরে মোহাম্মাদী" নামক উর্দূ সংবাদ কয়েক সংখ্যা ও খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লিখিত কয়েকখানি উর্দূ পুস্তিকা তাঁহাকে পড়িতে দেন। এই সকল পড়িয়া তাঁহার মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়।"

জীবনের প্রথম দিকে, সেই শৈশবে মেহেরউল্লাহর দিনগুলো ছিল প্রায় অন্ধকারে আচ্ছাদিত।

পিতার মৃত্যু, সংসারের অভাব, নানা ধরনের জটিলতায় তাঁকে বাধাগ্রস্ত করেছিল সত্য, কিন্তু তবুও তিনি থেমে থাকেননি।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, সাহস আর ধৈর্যের সাথে তিনি বিপদ মুকাবিলা করেছিলেন আর এগিয়ে গিয়েছিলেন সামনের দিকে। ক্রমাগত।

শৈশবে, চাঁদের মুখে কালো মেঘ ছিল। মেহেরউল্লাহ সেই মেঘ কেটে আবারও জোছনায় ভাসিয়ে দিলেন সমগ্র বাংলাকে। কিন্তু কিভাবে?

সে কথাই এখন জানবো আমরা।

www.pathagar.com

সতর্ক পদক্ষেপ

পিতার ইন্তেকালে শোকাহত সমগ্র পরিবার।

মেহেরউল্লাহও কাতর এবং ভারাক্রান্ত। সংসারে কোনো উপার্জন নেই। কিভাবে চলবে তারা?

কিশোর মেহেরউল্লাহকেও বিষয়টি ভাবিয়ে তুললো।

ফলে বন্ধ হয়ে গেল তাঁর নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার পথ।

ক্ষুধার্ত পরিবারের দিকে তাকিয়ে বুকটা শুকিয়ে ওঠে মেহেরউল্লাহর। বাধ্য হয়ে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে একটি সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন।

কিন্তু স্বাধীনচেতা মেহেরউল্লাহ।

কারুর গোলামীতে তাঁর বড় ঘৃণা। সুতরাং বাদ দিলেন চাকরী। এবার জনৈক আসগর আলীর পরামর্শে তিনি শুরু করলেন স্বাধীন এক ব্যবসা। দরজীগিরি। তাও সহকারী হিসেবে।

হোক না দরজীর সহকারী, তবুও এখানে তিনি বুক ভরে নিতে পারলেন স্বাধীন নিঃশ্বাস।

মেহেরউল্লাহর বয়স তখন কতইবা আর হবে? মাত্র উনিশ কি বিশ। এই বয়সেও তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পেত অবলীলায়।

দরজীর চাকরীটি দেবার সময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাকে বললেন, 'তুমি তো ছেলে মানুষ। তাছাড়া কাজেরও কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং একাজ তুমি কিভাবে করবে? হয়তো বা পারবে না।'

সাহেবের কথা শুনে মুহূর্তেই জবাব দিলেন মেহেরউল্লাহ,

'স্যার, একদিন আপনিও ছেলে মানুষ ছিলেন। একদিন আপনারও কাজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।'

মেহেরউল্লাহর জবাব শুনে দারুণ খুশি হলেন তিনি। আর সাথে সাথে তাকে চাকরীটি দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ যশোর খড়কী গ্রামের অভিজ্ঞ এবং নামকরা দরজী জাহা বখশের কাছে কিছুদিন কাজ শেখেন।

জাহা বখশ ছিলেন সাহেব বাড়ির খাস দরজী। সাহেব বাড়ি মানে এক ইংরেজ কর্মচারীর বাড়ি। মেহেরউল্লাহ তার কাছে কাজ শেখার কারণে স্থানীয় অনেক ইংরেজের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে গেল।

কাজের প্রতি ছিলেন মেহেরউল্লাহ অত্যন্ত মনোযোগী।

পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর একাগ্রতার কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দরজীগিরিতে খুব নাম করলেন।

যে কোনো কাজের জন্য চাই প্রথমত পরিশ্রম এবং সততা। আর এ দুটোই ছিল মেহেরউল্লাহর একান্ত ভূষণ। ফলে তিনি দ্রুত, খুব দ্রুত পরিচিত হয়ে উঠলেন সর্বমহলে।

প্রথমে তিনি দোকান দেন খোজাহাট গ্রামে। পূর্ণ আস্থা আর নিষ্ঠার সাথে কাজ শুরু করেন এখানে।

দরজীর কাজে আরও উন্নতির জন্য তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনাও করতে থাকেন।

ছোট্ট একটি দরজীর দোকান।

অথচ, মেহেরউল্লাহর সুনাম, সুযশ এতই ব্যাপক যে, চারপাশের লোকজন সবাই ছুটে আসে তাঁর দোকানে। ভিড় আর ভিড় লেগেই থাকে। ঠিক যেন সুশোভিত একটি মৌচাক।

মাত্র অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মেহেরউল্লাহর খরিদ্দার হয়ে গেল সাধারণ কৃষক, শ্রমিক থেকে একেবারে উচ্চ পর্যায়ের সাহেবরাও।

যখন তাঁর কাজের সুখ্যাতি গগনস্পর্শী, ঠিক এমনি সময়ে একজন সাহেব তাঁকে প্রস্তাব দেন দার্জিলিং যাবার। সাহেবও সেখানে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

সাহেবের নিবেদনটি ছিল আন্তরিক। ফলে মেহেরউল্লাহও রাজি হয়ে গেলেন।

দার্জিলিং-এ সত্যি সত্যিই সাহেব তাঁর জন্য একটি দরজীর দোকান করে দেন। চলছিল ভালই।

কিন্তু খুশি হতে পারছিলেন না মেহেরউল্লাহ।

www.pathagar.com

তাঁর কোথায় যেন একটা দায়বদ্ধতার কাঁটা কেবলই খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন ভাবলেন, না। এখানে, এই পরবাসে আর নয়। এবার ফিরে যেতে হবে আপন ভুবনে, নিজের ঠিকানায়।

যেই ভাবা, সেই কাজ।

মাত্র ছয়মাস পরই পাততাড়ি গুটিয়ে মেহেরউল্লাহ ফিরে এলেন নিজ বাসভূমে।

এবার দরজীর দোকান দিলেন যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানার মোড়ে।

আবারও দেখতে দেখতে জমে উঠলো মেহেরউল্লাহর ব্যবসা।

চারদিকে কেবল তাঁর খ্যাতির বাতাস। উড়ে যায় ফুর ফুর করে।

যতদূর যায়– ততদূরই মৌ মৌ গন্ধ। যে গন্ধে ছুটে আসেন সাধারণ মানুষ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও।

মেহেরউল্লাহর ব্যবসা সফলভাবে চলছে প্রচণ্ড গতিতে।

তিনি রাতদিন পরিশ্রম করেন।

সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

আর দোকানে উপস্থিত খরিদ্দারদের সাথে কথা বলেন প্রাণ খুলে। নানা প্রসংগে।

মেহেরউল্লাহ কাজ করেন, মানুষের সাথে কথা বলেন কিন্তু তাঁর কান দুটো সর্বদা খাড়া থাকে সতর্ক হরিণের মত।

তিনি খেয়াল করেন শুধু দোকানের দিকে নয়, দোকানের সামনে এবং চারপাশেও।

এ সময়ে তিনি অনুভব করেন এক অন্য রকম বীভৎস গন্ধ।

কিসের গন্ধ?

সচকিত এবং সতর্ক হয়ে ওঠেন প্রখর ধীসম্পন্ন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

এবং তারপর।–

তারপর সতর্ক পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যান তিনি সামনের দিকে। ক্রমাগত।

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

গর্জে উঠলেন একজনই

যশোরের একটি বিখ্যাত জায়গার নাম– দড়াটানা।

এখানেই মেহেরউল্লাহর দরজী দোকান। দোকানের সামনে মানুষের ভিড়।

কিসের এত ভিড়? কেন?

মেহেরউল্লাহ খেয়াল করেন সেদিকে। ক্রমে আরও বেশি ঝুঁকে পড়েন।

কি আশ্চর্য!

তাঁরই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কিনা খৃস্টান মিশনারীরা বক্তৃতা দিচ্ছে!

তাও আবার আল কুরআনের বিরুদ্ধে! ইসলামের বিরুদ্ধে!

আর এভাবেই কিনা বিভ্রান্ত করছে তারা সাধারণ মুসলমানকে!

মুহূর্তেই জ্বলে উঠলো মেহেরউল্লাহর ভেতরের পৌরুষ।

না! এটা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না!

কিন্তু বন্ধই বা করবেন কিভাবে?

গভীরভাবে ভাবতে থাকেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

সময় গড়ায়। সাথে সাথে কষ্টও বেড়ে যায় তাঁর।

সে কষ্ট অর্থের কষ্ট নয়।

নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-শোকের কষ্ট নয়।

সে কষ্ট– আপন জাতির জন্য।

আপন ভাই- মুসলমানের জন্য।

www.pathagar.com

এই কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য তিনি এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন।

তিনি দেখেন খৃস্টান মিশনারীরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

কিন্তু আফসোস! কোনো মুসলমানই এর প্রতিবাদ করছে না।

রুখে দাঁড়াচ্ছে না কেউ তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

তা না দাঁড়াক!

মেহেরউল্লাহ ভাবলেন, কেউ প্রতিবাদ না করলেও অন্তত আমাকে করতে হবে।

বাঁচাতে হবে এই জাতিকে খৃস্টান চক্রের নাগপাশ থেকে।

এর জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

মেহেরউল্লাহ এবার তাঁর সামান্য সেই লেখা-পড়াকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি কুরআন হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য খুব বেশি বেশি পড়তে থাকলেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকলেন নানাভাবে।

খৃস্টান মিশনারীরা বাংলা, বিহার, আসামের হাটে মাঠে, গ্রাম-গঞ্জে, সকল জায়গায় নানা কৌশলে তখন ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে মুসলমানকে।

এসব দেখে মেহেরউল্লাহ– মাত্র একজন মানুষই সেদিন প্রথম গর্জে উঠলেন।

না! –

খৃস্টান মিশনারীদেরকে এভাবে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যায় না।

তিনি রুখে দাঁড়ালেন।

জ্বলে উঠলেন প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে।

মেহেরউল্লাহ এবার দরজীর দোকান থেকেই শুরু করলেন তাঁর প্রতিবাদী দুর্বার যাত্রা।

তারপর সেখান থেকে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো বাংলা, বিহার, আসামের হাটে বাজারে, গ্রাম-গঞ্জে, শহর বন্দর সকল খানে।

www.pathagar.com

চলছে তাঁর বক্তৃতা, ভাষণ, তর্ক এবং যুক্তির শাণিত তলোয়ার।

সেই সাথে জবাবমূলক লেখনীও।

আপন সাধনা, চেষ্টা এবং পরিশ্রমে কি- না হয়!

মুনশী মেহেরউল্লাহ, স্বল্প শিক্ষিত এক সামান্য দরজী– সেই সামান্য মানুষটিই আপন চেষ্টায় আল্লাহর রহমতে পরিণত হলেন এক সিংহপুরুষে।

সে এক অসাধারণ মানুষ!

অসাধারণ ছিল তাঁর যোগ্যতা।

শহরে বন্দরে, হাটে মাঠে বক্তৃতা করেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

তাঁর বক্তৃতার মজলিশ মানেই হাজার মানুষের ঢল।

মেহেরউল্লাহ এই হাজার মানুষের সামনে তুলে ধরেন ইসলামের আলোকিত পথ।

দু'হাত বাড়িয়ে ডাকেন তিনি আলোর দিকে।

সত্যের দিকে।

আল্লাহর দিকে।

রাসূলের [সা] দিকে।

সর্বস্তরের মানুষ শোনে তাঁর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা। তারা মোহগ্রস্ত হয়ে যায় সেই বক্তৃতার যাদুর স্পর্শে।

কি অপূর্ব মেহেরউল্লাহর বক্তৃতা!

কি আশ্চর্য কৌশল তাঁর বর্ণনা এবং যুক্তির!

শ্রোতারা মুগ্ধ হয়।

আলোকিত হয়ে যায় তাদের হৃদয়-মন।

তারা ফিরে আসে পাপের পথ থেকে আলোর দিকে।

পরিত্যাগ করে তারা শিরক ও বিদআতের মত জঘন্যতম মহাপাপ।

www.pathagar.com

তাঁর বক্তৃতা শুনে হাজার হাজর বেনামাযী নামায পড়লো। সুদখোর মহাজনরা ছেড়ে দিল সুদের ব্যবসা। বেপর্দা নারীরা আবারও গ্রহণ করলো পর্দা। অনেক ন্যাড়া ফকির ও বিকৃতমনা মুসলমান– যারা নাকি শিরক-বিদআতে লিপ্ত ছিল, যারা কখনও নামায-রোযা করতো না, তারাও তাওবা করে ফিরে এলো আল্লাহর পথে। সত্য ও সঠিক পথে। জোছনাপ্লাবিত সুন্দরের পথে।

মেহেরউল্লাহর বক্তৃতার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না। বাগ্মিতায় এ দেশে এখনো তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

www.pathagar.com

সময়ের শত্রু-মিত্র

এতদিন বাধাহীনভাবে খৃস্টান মিশনারীরা বিভ্রান্ত করে যাচ্ছিল মুসলমানকে। করছিল তারা ধর্মান্তরিত। সেই সাথে দিয়ে যাচ্ছিল ইসলাম, কুরআন, নবী মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে যতোসব মনগড়া অপব্যাখ্যা। এতদিন এসবই চলছিল। কেউ প্রতিবাদ করতো না। এমনকি করতো না কোনো প্রশ্নও।

কিন্তু এবার বদলে গেল সময়ের চাকা। বদলে গেল বাধা-বিপত্তিহীন সেই বাতাসের গতিপথও।

কিভাবে?

এর মূলে ছিলেন একজন সাহসী পুরুষ– মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

তাঁর প্রতিবাদের ঝড়ে কেঁপে উঠলো মিশনারীদের মিথ্যার ভিত।

কেঁপে উঠলো তাদের পাপে ভরা কালো বুকটাও।

ভেতরে ভেতরে তারাও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো মেহেরউল্লাহর।

এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তখন অন্যতম ছিলেন খৃস্টধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠকরত্ন।

জন জমিরুদ্দীন ছিলেন বেশ শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিত। তাঁর ছিল আবার লেখার অভ্যাস। সেটাও ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতেন তিনি।

১২৯৮ সনের কথা।

এই সময়ে ২১, ২২ ও ২৩ শে আশ্বিন খৃস্টান পাদ্রীদের সাথে একটানা তিনদিন তর্কযুদ্ধ চলে মেহেরউল্লাহর।

www.pathagar.com

স্থানটি ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর।

সেদিন এই তর্কযুদ্ধে মেহেরউল্লাহর সাথে ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ।

খৃস্টান পাদ্রীরা যুক্তির পর যুক্তি পেশ করেন তাদের পক্ষে। আর তাদের প্রতিটি যুক্তিই খণ্ডন করে দেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

একদিন দু'দিন করে অবশেষে, অবশেষে তর্কযুদ্ধে তারা পরাজিত হলো।

বিজয়ী হলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

আর সেদিন, ঠিক এভাবেই ইসলাম ও মুসলমানকে গৌরবজনক সম্মানে অধিষ্ঠিত করলেন তিনি, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

পাদ্রীরা পরাজিত হলো বটে, কিন্তু হাল ছাড়লো না।

অপপ্রচার আর ষড়যন্ত্রের জাল তারা বিস্তার করেই চলেছে চারদিকে। সেই সাথে শত্রু ভাবতে শুরু করলো মেহেরউল্লাহকে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা।

মেহেরউল্লাহ তখন দরজীর দোকানের চৌহদ্দি পেরিয়ে নেমে গেছেন বাইরের বিশাল প্রান্তরে।

ইসলাম প্রচার-প্রতিষ্ঠার কাজে।

খৃস্টানদের অপপ্রচার থেকে ইসলাম ও মুসলমানকে হেফাজত করতে তখন তিনি বদ্ধপরিকর, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই কাজেই যশোর থেকে মেহেরউল্লাহ চলে গেছেন সদূর আসামে। স্থানটি ছিল আসামের অন্তর্গত গোয়াপিড়ি জেলার গৌরিপুর অঞ্চল।

সেটা ১৮৯২ সনের কথা।

মেহেরউল্লাহ কাজ করে যাচ্ছেন আসামে।

ঠিক এই সময়ে জন জমিরুদ্দীন 'খ্রিস্টীয় বান্ধব' নামক পত্রিকায় লেখেন একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম ছিল– "আসল কুরআন কোথায়?"

www.pathagar.com

"আসল কুরআন কোথায়" প্রবন্ধটি পড়েই জ্বলে উঠলেন মেহেরউল্লাহ। তিনি 'সুধাকর' পত্রিকায় "ঈসায়ী বা খ্রীষ্টানী ধোকা ভঞ্জন" শিরোনামে একটি দীর্ঘ লেখার মাধ্যমে জমিরুদ্দীনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঐ লেখার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। লেখাটি ছাপা হয় ৪ কিস্তিতে 'সুধাকর'-এর ১২৯৯ সনের ১৯ ও ২৬শে চৈত্র এবং ১৩০০ সনের ২রা ও ২৭শে বৈশাখ সংখ্যায়।

এরপর জমিরুদ্দীন আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সেই প্রবন্ধেরও জবাব দেন 'সুধাকর' পত্রিকার ১৩০০ সনের ১৭ই আষাঢ় সংখ্যায়।

মেহেরউল্লাহ জমিরুদ্দীনের প্রশ্নের জবাবে লিখলেন সেদিন "আসল কুরআন সর্বত্র"। এই দুটো জবাবমূলক লেখার মাধ্যমে মেহেরউল্লাহ একদিকে যেমন কুরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তাঁর লেখক-সত্তারও পরিচয় দিয়েছেন।

লেখার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ছিল তাঁর যুক্তিবাদী প্রজ্ঞা।

মেহেরউল্লাহর লেখা পড়ে হতবাক হলেন জন জমিরুদ্দীন।

তিনি ভাবতে থাকলেন।

ভাবলেন তাদের খৃস্টধর্ম নিয়ে, তারপর ইসলাম নিয়ে, পবিত্র আল কুরআন নিয়ে।

www.pathagar.com

শত্রু হলেন বন্ধু

যতই ভাবেন জমিরুদ্দীন, ততোই তিনি দুলে ওঠেন দ্বিধার তুফানে।

এভাবে, দুলতে দুলতে এক সময় তিনি নাগাল পেলেন আস্থাপূর্ণ সত্য কিনারের।

এবং তারপর।– তারপর জন জমিরুদ্দীন খুলে ফেললেন দ্বিধার পোশাক। আর পরে নিলেন ইসলামের পবিত্রতম আচ্ছাদন।

মেহেরউল্লাহর লেখায় খুলে গেছে জমিরুদ্দীনের বিবেকের দুয়ার।

খুলে গেছে বোধের খিড়কি।

ভেতরের চোখ।

ইসলাম গ্রহণের পর জন জমিরুদ্দীন চিঠি লিখলেন মেহেরউল্লাহর এক সাথী-বন্ধু মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের কাছে। সেই চিঠিতে ছিল তার হৃদয়ের কোমল আকুতি।

চিঠির জবাব দিলেন রেয়াজউদ্দীন যথাসময়ে। উত্তরে তিনি জমিরুদ্দীনকে লিখলেন :

"আপনার মত লোকের মাস্টারী বা পণ্ডিতি শোভা পায় না। পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করণার্থে আপনি জীবনোৎসর্গ করুন। আপনি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করুন! আমি তাঁহাকে আপনার বিষয় লিখিলাম, আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিবেন।"

রেয়াজউদ্দীনের পরামর্শে জমিরুদ্দীন চিঠি লেখেন মেহেরউল্লাহকে।

সতর্ক এবং সচেতন মেহেরউল্লাহ।

www.pathagar.com

তিনি কাল বিলম্ব না করে জমিরুদ্দীনের চিঠির জবাব দেন। সময়টি ছিল ১৩০৪ সনের ১২ই বৈশাখ। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই চিঠিতে মেহেরউল্লাহ লেখেন :

"মাননীয় সাহেব! আচ্ছালামো আলায়কোম, বাদ আরজ– আজ আপনার স্বহস্তে লিখিত পত্র পাঠে যে কি এক আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলাম, তাহা লেখনি দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সুধাকরে আপনার মুসলমান হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। রদ্দে-খ্রীষ্টানের জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, আজ তাহাই সত্য হইল, তজ্জন্য খোদা তায়ালার শত সহস্র শোকর গোজারী করিতেছি। আপনার ন্যায় শিক্ষিত ভ্রাতা যদি ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন তবে অবশ্যই সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। অন্যান্য বিষয়বস্তু পত্রে পরে লিখিতেছি। প্রচার কার্যে আপনি শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।"

ব্যস! এখন থেকে শেষ হলো জমিরুদ্দীনের শত্রু শত্রু খেলা এবং তিনি, একদিনের সেই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি– জন জমিরুদ্দীন হয়ে গেলেন মেহেরউল্লাহর সহযোদ্ধা, বন্ধু এবং অনেক কাছের– একান্ত আপনজন।

www.pathagar.com

সেই এক মানুষ

১৩০৪ সনের ১৮ই বৈশাখ।

মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনকে আর একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু সেই চিঠিতেও ছিল না ব্যক্তিগত কোনো সুখ-দুঃখের কথা। ছিল না নিজের কোনো চাওয়া-পাওয়ার কথা। সেখানে ছিল মেহেরউল্লাহর সেই দরদী হৃদয়ের আকুতি।

কিসের আকুতি?

সে কেবল ইসলামের প্রতি। দীনের প্রতি। আর সত্য আবিষ্কারের প্রতি।

তিনি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন জমিরুদ্দীনকে সত্য-সন্ধানের দিকে? সেটা এবার একটু দেখা যাক। মেহেরউল্লাহ জমিরুদ্দীনকে লিখলেন :

"প্রিয় ভ্রাতঃ! আচ্ছালামো আলায়কোম। পরে জানিবেন– আপনার [১৩০৪ সনের] ১৪ই বৈশাখের পত্র পাইলাম। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমত কিছুদিন ধর্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সুধাকরে' প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তিকা প্রকাশ করুন; যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদা তায়ালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহণ করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকটে পরিচিত হইলে আমরা দূর-দারাজস্থ ধর্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। আজ কাল বংগদেশে বাঙলা ভাষাভিজ্ঞ ইসলাম প্রচারকের এতই আবশ্যক হইয়াছে যে, আপাতত ২০/২৫ জন ভাল প্রচারক হইলেও সে অভাব পূরণ হয় না। আমিও

www.pathagar.com

এক সময় পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ক্রমে খৃষ্টীয় শাস্ত্র পাঠ করি এবং অন্তরে খ্রীষ্টীয় ধর্মই মুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি প্রকাশ্যে অবগাহিত [বাপ্তাইজ] হই নাই। সেই সময়ে আমি ঈশান বাবু খ্রীষ্টানের মুসলমান হওন বৃত্তান্ত এবং হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের লিখিত "খ্রীষ্ট ধর্মের ভ্রষ্টতা" পুস্তকদ্বয় পাঠ করি; তাহাতেই খোদা তায়ালার ফজলে আমার মনের গতি পরিবর্তন হয়। আমি সেই ১২৯৩ সালেই "খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা" প্রকাশ করি ও নিয়মিতভাবে হাটে বাজারে প্রচার আরম্ভ করি। যদিও আমি ভাল বাঙলা জানি না, তথাপি ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বংগীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন পরোপকারী, কল্যাণকামী এবং অভিভাবকতুল্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

শেখ জমিরুদ্দীনের জীবনে ছিল তাঁর ব্যাপক প্রভাব। সেই প্রভাব এবং প্রভার বর্ণনা জমিরুদ্দীন দিচ্ছেন এভাবে :

"... পরে মুনশী সাহেবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৩০৪ সালে তিনি আমার কৃত "ইসলাম গ্রহণ" প্রকাশ করিয়া আমার বিশেষ উপকার সাধন করেন। পরে ১৩০৪ সালের ১১ই ফাল্গুন মংগলবারে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পান্টি নামক স্থানে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। তাঁহার সহিত তালতলা হরিপুরের মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন। মুনশী সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সুফী আবদুল বারিকে কুমারখালী স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আহা! সেই দিন স্মরণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। মুনশী মোহাম্মদ আব্বাছ আলী সাহেব, হাজী মাহমুদ আলী সাহেব ও হাজী মেহের আলী সাহেব, ইহারা সকলেই সেদিন মুনশী

www.pathagar.com

সাহেবের সহচর ও অনুচর হইয়া কুষ্টিয়া, কুমারখালী, রাজবাড়ী, পাবনা, নাটোর, রংপুর, নিলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, করটীয়া, গোয়ালন্দ, কুচবিহার, ডায়মন্ড হারবার, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা, বরিশাল ইত্যাদি যেখানেই যখন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তথাকার হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপকৃত হইয়া শত মুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কৃত "রদ্দে খ্রীষ্টীয়ান, খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের অসারতা," "জোওয়াবোন্নাছারা" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক খ্রীষ্টীয়ান ও বিকৃতমনা মুসলমান পবিত্র ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছেন। তৎকৃত পান্দে নামার বংগানুবাদ একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক!"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন একজন নিবেদিত ইসলাম প্রচারক।

ইসলাম প্রচারের কাজে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

তাঁর কর্মতৎপরতা এতই ব্যাপক ছিল যে, যশোরের সীমানা পেরিয়ে সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতাসহ বহুদূর পর্যন্ত। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সেই সময়কার 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার একটি ভাষ্য আমাদেরকে এ বিষয়ে ধারণা দিয়ে যায়। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র, ১২৯৮/১৮৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় মন্তব্য। তাতে লেখা হয় :

"যশোর জিলার খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদনিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ও মুনশী মোহাম্মদ কাসেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবের কঠোর উদ্যমে খ্রীষ্টিয়ানগণের উদ্যম নিষ্ফল হইয়াছে।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি তেমন বেশি।

www.pathagar.com

কিন্তু যখন দেখলেন শিক্ষা ছাড়া, জ্ঞান আর বুদ্ধি ছাড়া খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের জবাব দেয়া অসম্ভব, যখন দেখলেন ইসলাম শিক্ষা ছাড়া প্রচারের কাজ করাও কষ্টকর, তখন– তখনই তিনি প্রচুর জ্ঞান আহরণের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

কি আশ্চর্য!

মেহেরউল্লাহ, তাঁর নিজের চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আয়ত্তে আনলেন ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, কুরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্যের এক বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার।

শুধু নিজের ধর্মের বই-পুস্তকই পড়লেন তা নয়। তিনি পড়লেন বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক, জেন্দ-আবেস্তাঁ প্রভৃতি।

এসব বিষয় শুধু পড়লেনই না। এসব বিষয় সম্পর্কে তিনি অর্জন করলেন সম্যক জ্ঞান এবং ধারণা।

মুনশী মেহেরউল্লাহর ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভা। আর ছিল প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি।

তিনি অসাধ্য সাধন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সারাটি জীবন।

সফলও হয়েছেন সেই এক বিরল পুরুষ– মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

www.pathagar.com

অসীম তাঁর ভালবাসা

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন ঠিক যেন আলোর প্রতীক।

আলো দেখলেই যেমন পতঙ্গেরা সেদিকে ছুটে আসে, আলোর ঝলকানিতে যেমন চারদিক ফক ফকা পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠিক তেমনি।

মেহেরউল্লাহ যেখানে, সেখানেই তাঁর ভক্তদের ভীড়। মেহেরউল্লাহ যেখানে, সেখানেই তারা- ঝলমল জোছনার মেলা।

সেই যে যশোরে দড়াটানা মোড়!

মেহেরউল্লাহর ছোট্ট একটি দরজীর দোকান।

কিন্তু, সেই ছোট্ট দোকানটি ঘিরেও ছিলো আলোর মিছিল। সেখানে জমা হতো সাধারণ-অসাধারণ মিলে কত মানুষ।

সবার মধ্যমণি– মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

সেখানে, সেই দরজীর দোকানে আলোচনা হতো ইসলাম প্রচারের কলা-কৌশল নিয়ে। আলোচনা হতো ইসলাম বিরোধীদের জবাব দেবার পদ্ধতি নিয়ে।

এ সময় মেহেরউল্লাহকে কেন্দ্র করে সেখানে, সেই যশোর দড়াটানা মোড়ে, তাঁর দরজীর দোকানকে সামনে রেখে গড়ে উঠলো একটি সাহিত্যের আড্ডা।

সেই আড্ডায় যোগ দিতেন আশপাশের মানুষ।

আসতেন অনেক সাহিত্যপিপাসু।

সেখানেও আলোচনা হতো কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে খৃস্টানদের অপপ্রচারের জবাব দেয়া যায়।

www.pathagar.com

এখান থেকেই মেহেরউল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন লেখার। তিনি ভাবলেন, না– একমাত্র মুখে মুখেই জবাব দিলে চলবে না। নিজে লিখতে হবে। অন্যকে দিয়ে লেখাতেও হবে।

কাজটা অনেক কঠিন এবং জটিল। সুতরাং দায়িত্বটাও অনেক বড়।

প্রকৃত অর্থেই মেহেরউল্লাহ একজন দায়িত্বশীল হিসাবে অবতীর্ণ হলেন। অবতীর্ণ হলেন একজন প্রকৃত অভিভাবকের ভূমিকায়। তিনি সবাইকে, নিজের সাথীদেরকে লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। উদ্বুদ্ধ করলেন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও। আর তিনি নিজেও তুলে নিলেন এক অসীম শক্তিশালী হাতিয়ার– কলম।

না, মেহেরউল্লাহর সাহিত্যকর্মের পিছনে ছিল না কোনো ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তা। ছিল না নিজের খ্যাতি, যশ, কিম্বা জাগতিক কোনো স্বার্থসিদ্ধির বাসনা। এসব পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থের জন্য মেহেরউল্লাহ কলম ধরেননি।

তিনি কলম ধরেছিলেন একমাত্র ইসলাম প্রচারের কাজকে আরও গতিশীল, আরও শক্তিশালী, আরও সুবিস্তৃত ও সুনিপুণ করে তোলার জন্য।

লেখার কাজটিকে তিনি বৈষয়িক উন্নতির সিঁড়ি হিসাবে না নিয়ে নিয়েছিলেন জাতীয় ও ধর্মীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁর এই যে অসামান্য আত্মত্যাগ, এই যে জাগৃতি, এই যে অনুভূতি এবং চেতনা-বোধ আজকের দিনে, সেসব ভাবতে গেলেও শরীরটা শিউরে ওঠে।

শুধু যশোরেই তাঁর এই মিশন সীমাবদ্ধ ছিল না।

তিনি যখন দার্জিলিং ছিলেন, সেখানেও তাঁকে ঘিরে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। সেই পরিমণ্ডলের নেতৃত্ব দিতেন তিনি।

এভাবেই একদিন জন্মলাভ করে মেহেরউল্লাহর প্রথম পুস্তক 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা'। এটির প্রকাশকাল ছিল ১৯২৩/১৮৮৬। আর এভাবেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ধর্মীয় সংগঠন– 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান'।

www.pathagar.com

'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান' সংগঠনের তখন ছিল ব্যাপক প্রভাব। এর কার্যক্রমেরও ছিল ব্যাপক পরিধি। এই আঞ্জুমানের এক অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে যশোর এসেছিলেন বরেণ্য সব পণ্ডিত। এদের মধ্যে ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, মৌলবী মেরাজ উদ্দীন প্রমুখ।

মেহেরউল্লাহ জানতেন, একা কাজ করার চেয়ে সকলে মিলে কাজ করলে তার ফায়দা হয় অনেক বেশি। সুতরাং তিনি সম্মিলিতভাবে ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিলেন। তাঁর এই মহতী উদ্যোগেরই অংশ লেখক তৈরি, বই প্রকাশানায় সহযোগিতা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা, বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন, সমিতি প্রভৃতি গঠন এবং পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন।

এই সময়ে মেহেরউল্লাহ 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'র সাথে সংযুক্ত হন। মেহেরউল্লাহ ছিলেন এই সংগঠনটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বদরউদ্দীন হায়দার, নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া, ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী [রহ] প্রমুখ।

এছাড়া মেহেরউল্লাহ রাজশাহী শহরের 'নূরুল ঈমান সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সনে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহাদেবপুরের বাসিন্দা মির্জা ইউসুফ আলী। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন সাবরেজিস্ট্রার।

রাজশাহী শহরে তখন যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

১৮৬৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সংস্থা। ১৯০৫ সনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার আগে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র মত প্রতিষ্ঠানই ছিল মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ এবং সংরক্ষণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

বা সংস্থা। মেহেরউল্লাহ নিজে ব্যক্তিগতভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে একজন সাধারণ কর্মীর মত কাজ করে গেছেন সারাটি জীবন।

ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা কালের সেই গুরুত্বপূর্ণ সভাতেও মেহেরউল্লাহ বক্তৃতা করেছিলেন। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনেও তিনি হাজির হয়েছিলেন। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ ৯ ও ১০; ১৩১০/১৯০৩ সনে।

পরবর্তী দ্বিতীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলন, কুমিল্লায় [পশ্চিম গাঁও, কুমিল্লা] যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩১২/১৯০৫ সনে, মেহেরউল্লাহ সেই সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপস্থিত-ই হননি, তিনি এখানে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে উপস্থিত সকলকেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ করেছিলেন।

এসব সামাজিক দায়িত্বও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

উদ্দেশ্য ঐ একটাই। ইসলামকে, ইসলামী আদর্শ ঐতিহ্য এবং শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল।

এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি একদিকে বেছে নিলেন বক্তৃতা, অন্যদিকে লেখা।

পাশাপাশি অব্যাহত ছিল তাঁর নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা।

নিজে সাংবাদিক না হলেও এক সময় মেহেরউল্লাহ অনুভব করলেন, সংবাদপত্রের রয়েছে এক বিশাল ভূমিকা। সংবাদপত্রের এই ভূমিকার কথা চিন্তা করে মেহেরউল্লাহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি যখন যেখানেই বক্তৃতা করতে গেছেন, সেখানেই তিনি 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

১৯২৮। এই সময়ে পিরোজপুরে অনুষ্ঠিত হলো খৃস্টান-মুসলিম তর্কযুদ্ধ। এই তর্কযুদ্ধে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ উপস্থিত হয়েছিলেন 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে।

কৌতূহলের বিষয়ই বটে!

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

দিলখোলা এক মানুষ।

তিনি যে কতভাবে, কত বিচিত্র ধারায় ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা ভাষায় বর্ণনাতীত।

ইসলামকে মেহেরউল্লাহ ভালবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে। ইসলামকে ভালবেসেই তিনি ভালবেসেছিলেন মানুষকে। মানবতা ছিল তাঁর অন্যতম ভূষণ। অপরের প্রতি দয়ামায়া, কর্তব্য, আতিথেয়তা, মঙ্গল কামনা– কোনো কিছুতেই তাঁর তুলনা হয় না।

এসব কারণেই মেহেরউল্লাহর এক অন্যতম সতীর্থ বন্ধু– যশোরের মির্জা ইউসুফ আলী সেই সময়ে মেহেরুল্লাহকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে অভিহিত করেছিলেন।

মির্জা ইউসুফ আলী তাঁর 'দুগ্ধ সরোবর' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা। যেমন :

"বঙ্গবন্ধু মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব ও তাঁহার সহকারীগণের অমূল্য প্রচার প্রচেষ্টা, শিক্ষা সমিতি ও ইসলামী মিশন গঠন, বিখ্যাত 'সোলতান' পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণের আপ্রাণ পরিশ্রম, শিক্ষা সমিতির প্রতি দেশের বড় লোক ও রাজ পুরুষগণের উজ্জ্বল সহানুভূতি, মিশনকার্য শৃংখলার সহিত গঠনার্থে পরম ভক্তি-ভাজন ছুফী আবু বকর, 'সোলতানের' ভূতপূর্ব সম্পাদক মনিরুজ্জামান, 'মোহাম্মদী' সম্পাদক মৌলবী আকরম খাঁ, 'মোসলেম হিতৈষী' সম্পাদক মৌলভী মুজিবুর রহমান প্রভৃতি মহাপ্রাণ লোকের অতুলনীয় চেষ্টা, চট্টগ্রামের বঙ্গীয় স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঠন, কো-অপরাটিভ সোসাইটি অর্থাৎ

www.pathagar.com

বিশ্বাসমূলক ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে গভর্নমেন্টের আইন প্রণয়ন, স্থানে স্থানে মুসলমান কর্তৃক চর্মদাবাগৎ ইত্যাদি ব্যবসায়ের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত– এই প্রকার চিহ্ন দৃষ্টে বোঝা যায় সমাজপতিগণের মনোযোগ ঐ চতুর্বিধ কার্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে।"

'বঙ্গবন্ধু'!

'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি সেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।

প্রকৃত অর্থেই মেহেরউল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি 'বঙ্গবন্ধু'। যিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবেসেছিলেন অবহেলিত, নির্যাতিত, পতিত এবং দিকভ্রষ্ট বাংলার মানুষকে।

তিনি ভালবেসেছিলেন অত্যন্ত আপন করে। বাংলার মানুষকে ভালবেসেই তিনি কাটিয়েছেন সারাটি জীবন। আর দু'হাতে ভেঙ্গেছেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। ক্রমাগত।

www.pathagar.com

দৃষ্টির সীমায় জোছনার ঢল

সিরাজগঞ্জের কড়উতলি মাঠ।

এই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর এক বিশাল জনসভা।

চারপাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসছে লোকজন।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ বক্তৃতা দেবেন।

কম কথা নয়!

এই জন্যই সেখানে বেড়ে যাচ্ছে মানুষের ঢল।

এই জনসভায় উপস্থিত হলেন একটি কিশোর। বেশ টগবগে তরুণ। তাঁর চোখে মুখে সাহস আর তারুণ্যের ঝিলিক দেখে চমকে উঠলেন মেহেরউল্লাহ।

কিশোরটির নাম ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

পরবর্তীকালে এই কিশোরটিই হয়েছিলেন এক বিখ্যাত কবি ও সমাজ সেবক।

মেহেরউল্লাহর এই বিশাল জনসভায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী আবৃত্তি করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা। নাম 'অনল প্রবাহ'।

সিরাজী তখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র।

কিন্তু সেই বয়সেই, তাঁর কণ্ঠে 'অনল প্রবাহ' কবিতার আবৃত্তি শুনে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

তরুণ তো নয় যেন বারুদের কণা!

www.pathagar.com

শুধু তিনিই নন। কবিতাটি সমগ্র জনসভায় ছড়িয়ে দিল আগুনের ফুলকি।

কবিতা! অথচ কি তার টান টান ছন্দ। কি তার বক্তব্য এবং ভাষা। কবিতার প্রতিটি শব্দের সাথে মিশে আছে উদ্দীপনা আর এক একটি বারুদ স্ফুলিঙ্গ। যেন মুহূর্তেই জ্বলে উঠবে।

অবাক মেহেরউল্লাহ!

অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি সিরাজীর দিকে।

তাঁর চোখে ফুটে উঠলো মুগ্ধতার ছায়া।

সিরাজীকে চিনে নিতে তাঁর এতটুকু দেরি হলো না।

হবে কেন?

'রতনে রতন চেনে।'–

সিরাজীর মধ্যে তেজ এবং স্বপ্নের দ্যুতি দেখে আশান্বিত হলেন মেহেরউল্লাহ।

১৩০৬ সনের কথা।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এই বছর নিজ খরচে সিরাজীর সেই বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' প্রকাশ করলেন।

শুধু প্রকাশই করলেন না, কাব্যগ্রন্থটি সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি পালন করলেন বিভিন্নভাবে।

মেহেরউল্লাহ সেদিনই বুঝেছিলেন, এই কবি এবং তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি আমাদের সমাজের জন্যে খুবই প্রয়োজন। অতএব তিনি বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এলেন একজন প্রকৃত দরদী অভিভাবকের ভূমিকায়।

পরবর্তীতে, এই ইসমাইল হোসেন সিরাজীই আবার নজরুল ইসলামের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়।

তিনিও মেহেরউল্লাহর মত নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুলের জন্যে পাঠিয়েছিলেন ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ এক মূল্যবান উপঢৌকন।

www.pathagar.com

অংকের দিক থেকে হয়তো বা তেমন বেশি কিছু নয়। মাত্র দশ টাকা।

তবুও কম কিসে?

সেই ১৯২০/২১ সনের কথা। তখনকার দশ টাকার সমান এখনকার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। কিংবা তার চেয়েও বেশী।

এই টাকা সিরাজী পাঠিয়েছিলেন নজরুলের নামে। তাঁর কবিতা পড়ে, মুগ্ধ হয়ে। নজরুলের মুখেই শুনা যাক এর কিছুটা অংশ।

নজরুল বলছেন :

"আমি তখন প্রথম কাব্য-কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি– ফিঙে, বায়স, বাজপাখীর ভয়ে ভীরু পাখীর মতো কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও মতো দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখ-চঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়– প্রমাণ রীতির দুর্দিনে মনি অর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে সিরাজী সাহেবের হাতে লেখা : 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশী হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইবো। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম'।"

টাকা থাকলে নিশ্চয়ই দশ হাজার পাঠাতেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। আমরা তাঁর হৃদয়ের সেই উষ্ণতা, উদারতা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে জানি।

সিরাজীর এই মহৎ চরিত্রের পিছনে নিশ্চয়ই মেহেরউল্লাহর অবদান রয়েছে অনেক বেশি।

কারণ তিনিও মেহেরউল্লাহর কাছ থেকে জীবনের সেই প্রথমভাগে পেয়েছিলেন এক অভাবনীয় পুরস্কার।

অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া সেই উৎসাহ আর পুরস্কারের কথা শেষ জীবনেও ভুলতে পারেননি ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ!

মেহেরউল্লাহ ছিলেন ফুলের মত। তাঁর চারপাশে ভিড় করতো মধু পিয়াসী মৌমাছি।

www.pathagar.com

এভাবেই তো জড়ো হয়েছিলেন, আলোকিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মেহেরউল্লাহর ভাবধারায় কতিপয় সত্যসন্ধানী উজ্জ্বল পুরুষ। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি গোলাম হোসেন, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন কাব্যবিনোদ প্রমুখ।

এছাড়া মেহেরউল্লাহ যে একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন, সে কথা তো একটু আগেই আমরা জেনেছি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি', 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম', 'কেরামতিয়া মাদ্রাসা', 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই কর্মবীর– মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

সময়কে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিতেন মেহেরউল্লাহ।

তিনি নিজে যেমন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোনো রকম অপচয় পছন্দ করতেন না, তেমনি অপচয় করতেন না মহামূল্যবান সময়।

প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাঁর কাছে জীবনের মত দামি। তিনি মনে করতেন, মানুষের আয়ু কম, কিন্তু কাজ বেশি। সুতরাং স্বল্প জীবনে ব্যাপক কাজ করতে হবে। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর কবিতার মাত্র কয়টি লাইনের সাথে আমরা এখন পরিচিত হবো। তিনি লিখছেন :

"ভাব মন দমে দম রাহা দূর বেলা কম
ভুখ বেশী অতি কম খানা,
ছামনে দেখিতে পাই পানি তোর তরে নাই
কিন্তুরে পিয়াসা ষোল আনা।"

ওপরের মাত্র কয়েকটি লাইনের ভিতর দিয়ে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মানস এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমরা পরিচিত হলাম।

www.pathagar.com

হ্যা, এটাই ছিল মূলত মেহেরউল্লাহর জীবন। তাঁর একান্ত সাধনা।

তিনি সব সময় মনে রাখতেন– রাস্তা বেশি, সময় কম। সুতরাং বেলায় বেলায় মঞ্জিলে পৌঁছুতে হলে অবশ্যই দ্রুত– খুব দ্রুতগতিতে ছুটতে হবে। সামনের দিকে।

তিনিও যে সেইভাবে, দ্রুতগতিতে ছুটেছিলেন, তা তাঁর মাত্র ছেচল্লিশ বছর জীবনকালের ব্যাপক-বিশাল কাজের দিকে তাকালে আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

প্রকৃত অর্থে, এমনটিই হওয়া উচিত। অন্তত আমাদের জীবন। মুনশী মেহেরউল্লাহর মত সতত কর্মচঞ্চল।

www.pathagar.com

সংগ্রাম ছোটে স্বপ্নের দোলায়

সময়টা ছিল দারুণ খারাপ।

ইংরেজদের শাসন-শোষণে তখন অতিষ্ঠ মুসলমান।

বিপন্ন তাদের জীবন।

শুধু জীবন নয়, বিপন্ন তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং সামাজিক জীবনের গতিধারা।

কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষণ কিংবা নির্যাতন নয়।

সেই নির্যাতন ছিল বহুমুখি।

ইংরেজ-খৃস্টানদের আক্রমণ ছিল বহুমাত্রিক।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, তাদের সেই আক্রমণের শিকার ছিল প্রধানত মুসলিম সমাজ।

দিকে দিকে তখন চলছে খৃস্টান মিশনারীদের উৎপাত এবং তৎপরতা। নানা কূটকৌশলে তারা মুসলমানকে খৃস্টান বানাচ্ছে।

নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও খৃস্টান হচ্ছে অর্থের লোভে। অথচ, আশ্চর্যজনকভাবে নীরবতা পালন করছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।

শুধু নীরবই নয়, বরং তারা খৃস্টানদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে। আর তাদের সাথে হিন্দারাও মুসলমানকে শত্রু এবং শিকার ভাবতে শুরু করেছে।

কি নিদারুণ অবস্থা!

ঠিক এমনি এক দুঃসময়ে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ গর্জে উঠলেন। মেলে ধরলেন তাঁর সাহসী ডানা। ঈগলের মত।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর ডানার নিচে আশ্রয় দিতে চান কেবল মুসলমান নয়, নিম্নবর্ণের সেইসব হিন্দুকেও, যাদেরকে খৃস্টানরা বিভ্রান্ত করেছে। করেছে বেপথু।

মূলত এই ছিলেন মেহেরউল্লাহ।

এই ছিল তাঁর মানবিকতা এবং উদারতা। এই ছিল তাঁর বিশালতা।

তিনি খৃস্টানদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন মুসলমান-হিন্দু– উভয় জাতিকেই।

কিন্তু কিভাবে?

সাধারণ মানুষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মেহেরউল্লাহ ভাবলেন– তাদেরকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া এই মুহূর্তে বিকল্প কোনো পথ নেই।

অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জাগানোর জন্য এই মুহূর্তে হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন সরাসরি যুক্তির মাধ্যমে বুঝানোর।

এই কাজের জন্যে মেহেরউল্লাহ প্রথমত বেছে নিলেন বক্তৃতা।

না, নিজেকে জাহির করার জন্য নয়। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়, নয় বৈষয়িক কোনো উন্নতির জন্য।

মেহেরউল্লাহ বক্তৃতাকে বেছে নিলেন কেবল খৃস্টানদের হাত থেকে নিগৃহীত মুসলমান ও হিন্দুদেরকে রক্ষার জন্য।

উদ্দেশ্যটি ছিল মহৎ।

আর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তবে সেই কাজে আল্লাহর রহমতও পাওয়া যায়। এর বাস্তব প্রমাণ মেহেরউল্লাহর সংগ্রামমুখর জীবন।

মেহেরউল্লাহর জনসভায় উপস্থিত হতো হাজার হাজার মানুষ।

এটা কি কম কথা!

বাদ্য নয়, সঙ্গীত নয়, নৃত্যও নয়। কেবল একজন মানুষের মুখের কথা শুনার জন্য হাজার-হাজার মানুষের ঢল!

www.pathagar.com

এটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়!

অথচ তাই হতো। মেহেরউল্লাহর একজন জীবনীকার, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের কথায়ও আমরা এমনি সত্য খুঁজে পাই। তিনি লিখছেন–

"তাঁহার নামে একদিকে যেমন পঙ্গপালের ন্যায় গ্রাম্য জনসাধারণ ছুটিয়া আসিত, ঠিক সেইরূপ বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীও তাঁহার সভায় পূর্ণ আগ্রহের সহিত সমবেত হইতেন।"

মুনশী জমিরুদ্দীন তার 'মেহের চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন বাগ্মী আছেন, ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম।"

কেমন ছিল মেহেরউল্লাহর বক্তৃতা? এক কথায় চমৎকার। অসাধারণ। কিন্তু কতটা অসাধারণ, কি ছিল তার বৈশিষ্ট্য?

এ বিষয়ে কবি শেখ ফজলল করিম আমাদেরকে জানাচ্ছেন কিছুটা। তিনি লিখেছেন :

"জীবনে বিভিন্ন জাতীয় বহু বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহারা বেশ ভাবিয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কিন্তু মুনশী সাহেবের বক্তৃতার ধারা আমার কাছে অন্য রকম মনে হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে হইত না। কি এক ভাবে যেন তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন, আর কথাগুলি অনর্গল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। তিনি কথা শুরু করিলে থামিতেন না– ঝর্ণার পানির মতই তাঁহার কথার ধারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় সরস করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিত, অথচ তাঁহার মধ্যে একটি অসঙ্গত, অবান্তর বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক কথা থাকিত না। এজন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন অসাধারণ বাগ্মী। যেন যাদু মিশে থাকতো তাঁর বক্তৃতায়। তাঁর কথায়। তাঁর উচ্চারণে।

www.pathagar.com

খুলনার দৌলতপুর।

দৌলতপুরে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশাল জনসভা। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত লেখক– কাজী এমদাদুল হক। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর যাদুকরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন :

"...কয়দিন পর্যন্ত আমি তাঁহার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই বক্তৃতার ঝংকার যেন শয়নে স্বপনে আমার মনের মধ্যে তন্ময়তা ঢালিয়া দিত।"

১৩০৫ সন।

নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি বিশাল জনসভা।

সেই জনসভার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। সেদিন, সেই জনসভায় মেহেরউল্লাহ হৃদয়ের সকল আবেগ ঢেলে দিয়ে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর সেই বক্তৃতার প্রভাব পড়েছিল উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার ওপর। তারা সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন মেহেরউল্লাহর দিকে।

এই জনসভার পরপরই, তৎকালীন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় মর্মস্পর্শী একটি সুদীর্ঘ লেখা প্রকাশিত হয়। পয়ার ছন্দে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই লেখাটির নাম 'আখলাকে আহমদীয়া'। লিখেছিলেন সেই সময়কার এক নামকরা কবি– আবদুর রহিম। তাৎপর্যপূর্ণ এই লেখাটির অংশ বিশেষের সাথে আমরা এখন পরিচিত হবো :

"মুনশী মেহেরউল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া আছে যার খোশ নাম ॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হিদায়াতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার ॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হিদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু খ্রীস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া ॥

www.pathagar.com

মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া ॥
তার সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার ॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সাল ছিল বাংলার ॥
সেই সালে রমযানে ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালী শহর বিছেতে ॥
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিল ইস্কুলে,
শুনিয়া তামাম লোক আনন্দিত দেলে।
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউন হলেতে;
সেদিনের বাত এবে শুন সকলেতে–
জজ কালেকটর আর যতেক হাকিম
মুনশী মৌলবী আর যতেক আলিম।
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃষ্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।
--- --- --- ---
এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান,
হিন্দু-মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে শেখ ফজলল করিম লিখেছেন :

"অন্যান্য বক্তারা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন অনেক লোক তাহা মনোযোগ দিয়া না শুনিয়া গোলমাল করিতেছিল। মুনশী সাহেব এই অশান্তি নিবারণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যে যাহা বলিলেন তাহাতে মনে হইল সভায় যেন আর একটিও জীবিত

www.pathagar.com

মানুষ নাই– চিত্রার্পিতের মত সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোলমাল থামিয়া গেল।"

শেখ ফজলল করিম মেহেরউল্লাহর বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন :

"তিনি নিজের সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এজন্য কত মানুষকে সভা ক্ষেত্রে হা হা রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক, তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যের এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহুকালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে। বাংলার আত্মবিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে। এক কথায় সমাজ জাগিয়াছে। নব যুগের জয় পতাকাধারী অনেক তরুণ সেবক আসিয়া সমাজ সেবায় আত্মোৎসবর্গ করিয়াছেন। দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনে হয় মুনশী সাহেবের মত বাগ্মী যদি সেই সময় আমাদের মধ্যে দেখা না দিতেন, তাহা হইলে বাংলার মুসলমানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যতটুকু অগ্রসর দেখিতেছি ততটুকুও বোধহয় দেখিতে পাইতাম না। তাঁহার প্রতিভার আলো সূর্যরশ্মির মত সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে সমাজের অন্ধতা অনেকটা দূর হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার দিকে মুসলমানদের নজর পড়িয়াছে। বলিতে কি এ নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্মবীরের আজও অভাব আছে।"

এক সময়ের প্রধান বিরোধী এবং পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠ সহচর শেখ জমিরুদ্দীন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়ে গেছেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর বক্তৃতা সম্পর্কে তাঁরই নিত্য সহচর শেখ জমিরুদ্দীনের বক্তব্য হলো :

"১৩০৪ সালে তিনি আমার কৃত "ইসলাম গ্রহণ" প্রকাশ করিয়া আমার বিশেষ উপকার সাধন করেন। পরে ১৩০৪ সালের ১১ ফালগুন মঙ্গলবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত পান্টি নামক স্থানে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। তাঁহার সহিত

www.pathagar.com

তালতলা হরিপুরের মৌলবী আবদুল আজীজ সাহেব ছিলেন। মুনশী সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সূফী আবদুল বারিকে কুমারখালি স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আহা! সেইদিন স্মরণ করি। হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। মুনশী মোহাম্মদ আব্বাস আলী সাহেব ও হাজী মেহের আলী সাহেব ইহারা সকলই সেদিন মুনশী সাহেবের সহচর ও অনুচর হইয়াছিলেন। ইহারা আমাকে এত সমাদর করিলেন যাহা বর্ণনাতীত।"

এরপরই জমিরুদ্দীন লিখছেন :

"এই সময় অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ফালগুন হইতে ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই ১০/১১ বৎসর কাল আমি মুনশী সাহেবের অনুচর হইয়া নানা স্থানের ধর্মসভাতে বক্তৃতা করিয়াছি। ১৩০৪ সালের চৈত্র মাসে রানা ঘাটের পাদ্রী মনহরা সাহেবের সহিত তর্ক উপলক্ষে যে বিরাট সভা হইয়াছিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব তৎকালে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখেন। ঐ সভাতে আমি তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলাম। ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমরা যশোহর জেলার কেশবপুর অঞ্চলে প্রচার করিয়া পরে নোয়াখালী গিয়াছিলাম। নোয়াখালীর টাউন হলে ও রাজকুমার স্কুলে মুনশী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, উকিল, মোক্তার সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে তিনি কুষ্টিয়া, কুমারখালী, রাজবাড়ি, পাবনা, চাটমোহর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নীলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, করটিয়া, গোয়ালন্দ, কুচবিহার, ডায়মণ্ড, হারবার, নদীয়া, যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা, বরিশাল ইত্যাদি যেখানেই যখন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তথাকার হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই উপকৃত হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট বক্তা হিন্দু সমাজেও আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যে কেবল বক্তৃতা করিতে পারিতেন তাহা নহে, রচনা ও মুশাবিদা করিবার ও গ্রন্থাদি লিখিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।"

www.pathagar.com

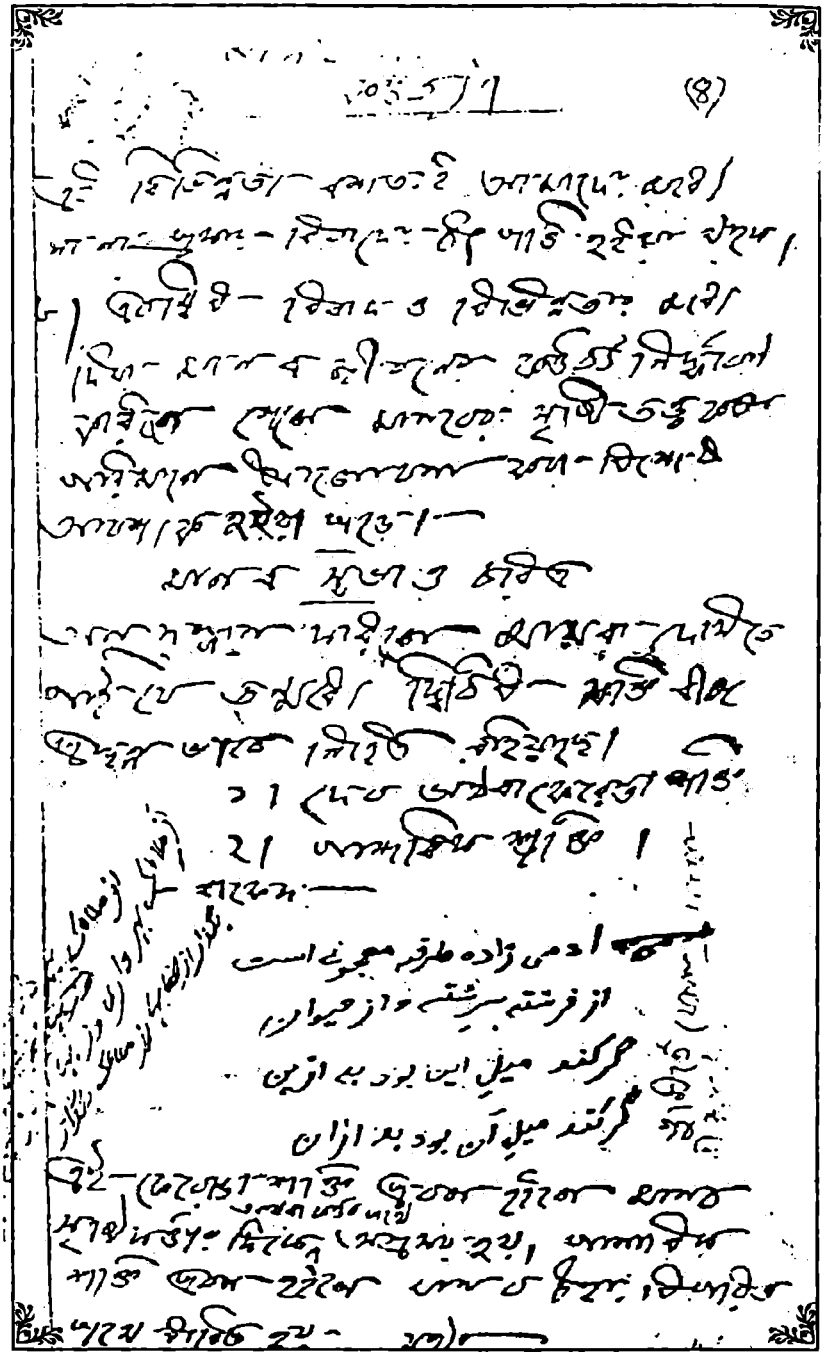

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

জমিরুদ্দীন ঠিকই বলেছেন :

"মুনশী সাহেবের ওয়াজ শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক বেদআত পরিত্যাগ করিয়া দ্বীনদার হইয়াছে। স্থানে স্থানে তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাসা কারামাতিয়া ও মাদ্রাসা আহমদীয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। অনেক সুদখোর মহাজন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সুদ পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেক বেপর্দা স্ত্রী তাঁহার নছিহত শুনিয়া পর্দানশীন হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেক ন্যাড়ার ফকির ও বিকৃতমনা মুসলমান তাঁহার নিকটে তাওবা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থে বাংলার মানুষের একান্ত বন্ধু। আপনজন।

সবার সুখ-দুঃখের সাথে তিনি সমানভাবে একাত্ম হয়ে যেতেন।

তাঁর চরিত্র ছিল অনুকরণীয়।

মানবতা ছিল তাঁর একান্ত ভূষণ।

সেই সময়ে তিনি অনেক হিন্দু ছেলেকেও বিনা বেতনে লেখা-পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষারও সুব্যবস্থা করেছিলেন।

অনেকেই তাঁকে মনে করতেন, তিনি বাঙ্গালীর 'বঙ্গবন্ধু'। তাঁকে নানা বিশেষণেও অভিহিত করা হতো। যেমন– 'মার্টিন লুথার', 'শংকরাচার্য', 'বিদ্যাসাগর', 'রামমোহন' ইত্যাদি।

সত্য বলতে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন ঐসব মনীষীর গুণের সমন্বয়ে অন্য এক অসাধারণ মানুষ। ঠিক তাদের মত নয়। বরং পৃথক আলোকিত ভুবনের এক মহান কালপুরুষ।

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

মিলন মেলার সেই যে গোলাপ

১৩০৬ সনের ৫ই অগ্রহায়ণ। ইংরেজী ১৮৯৯।

সময়ের দিক থেকে একশো বছরেরও আগের কথা। ঠিক এই সময়ে যশোর জেলার কেশবপুরে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশাল তর্কসভা। একপাশে আছে হানাফী মাজহাবের অনুসারীরা। আর অপরপাশে মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের লোক।

তর্কসভা। কিন্তু কি বিশাল আয়োজন!

এই তর্কসভায় যোগদান করেছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, কুরআন-অনুবাদক মৌলবী আব্বাস আলী প্রমুখ।

তাঁরা সবাই ছিলেন বিশিষ্ট আলেম এবং গুণী ব্যক্তিত্ব।

তর্কসভা। কিন্তু বেশ ভয়ংকরও বটে।

প্রথমে শুরু হয় আস্তে, শান্তভাবে সরল সহজ কথা দিয়ে।

তারপর ক্রমশ বেড়ে যায় কথার আওয়াজ। বেড়ে যায় উত্তেজনা। আর উত্তেজনা থেকে এক সময় শুরু হয়ে যায় গালাগালি, হাতাহাতি এমনকি ভীষণ রক্তক্ষয়ী মারামারি বা সংঘর্ষ।

এই যখন হয় তর্কযুদ্ধের অবস্থা, তখন সেখানে হতাহত হতেও আর কতক্ষণ লাগে!

কাজটা ভাল নয়। তবুও পরিস্থিতি বাধ্য করলে আর উপায় থাকে না।

কেশবপুরের তর্কসভা নিয়েও চলছে টান টান উত্তেজনা। অনেকের ভেতর দোল খাচ্ছে ভয় এবং শংকা। না জানি আবার কখন রক্তারক্তি শুরু হয়ে যায়!

www.pathagar.com

সময় গড়ায়। এক সময় শুরু হয় তর্কযুদ্ধ।

এই সভায় উপস্থিত আছেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

সবার দৃষ্টি তাঁর দিকেই।

সবার চোখে প্রতীক্ষার কুয়াশা। ভাবটা এমন, দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, না। কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো না। বরং গালাগালির পরিবর্তে গলাগলিতে পরিণত হলো তর্কসভাটি। বিস্ময়করই বটে!

মাত্র একজন মানুষ– মুনশী মেহেরউল্লাহর জন্যই এমনটি হয়েছিল। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সেই দিনের ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"উক্ত তর্কসভারূপ সমরক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আলেমরূপ বীর সেনাপতিগণ যখন স্ব স্ব দলীল-প্রমাণের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি শানাইতেছিলেন, যখন আসন্ন ঝটিকাবর্তের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধ প্রকৃতির ন্যায় সমগ্র সভাক্ষেত্র নীরব উন্মাদনায় ভরপুর, ঠিক সেই সময় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নামে উভয় দলের সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতা সহকারে স্বকীয় বৈশিষ্টে ওজস্বিনী ভাষায় এরূপ তর্ক-বাহাসের অপকারিতা ও অনাবশ্যকতার বিষয় এমনভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মুহূর্ত মধ্যে সেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বিষ কলুষিত সভাক্ষেত্র শান্তি ও প্রেম-পবিত্রতার অমিয় প্রবাহে ভাসিয়া গেল। হানাফী ও মোহাম্মদী সকলেই এক নবীর উম্মত ও এক কুরআনের অনুসরণকারী একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর কাহারো বিলম্ব হইল না। মুসলমান সকলেই পরস্পরের ভাই, কুরআন শরীফের এই অমর উক্তির সম্মান সকলেই রক্ষা করিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সমস্ত আলেমই

www.pathagar.com

অবনত মস্তকে মুনশী সাহেবের মীমাংসা মানিয়া লইয়া একই মহান ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলেন।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এই সময়ে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভা দুটোতে উপস্থিত ছিলেন শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নও। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর সাথে হবিবর রহমানের প্রথম সাক্ষাতটি হয় এখানেই।

১৩০৬ সনের ৭ই জ্যৈষ্ঠ [ইংরেজী ১৮৯৯]। স্থান– খুলনা জেলার পায়গ্রাম কসবা এবং দৌলতপুর উচ্চবিদ্যালয় [বর্তমান : মহসিন উচ্চবিদ্যালয়]।

দৌলতপুর অনুষ্ঠিত সেই জনসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন লিখেছেন :

"খুলনা টাউন হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনশী মেহেরউল্লাহর নাম শুনে নাই তখনকার দিনে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান এমন কোন লোক বড় একটা ছিল না। খুলনা টাউনের খুব কম শিক্ষিত লোকই উক্ত সভায় যোগদান করেন নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খান বাহাদুর মৌলবী কাজী এমাদদুল হক বি-এ, বি-টি মরহুম সাহেব ঐ সভায় যোগদান করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।... ঐ সভায় ৪/৫ ঘন্টাকাল পর্যন্ত জনাব মুনশী সাহেব মরহুম যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া বক্তার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিতে কি সেই বক্তৃতার মধ্যে যে মাদকতা ছিল, কয়দিন পর্যন্ত আমি তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই বক্তৃতার ঝঙ্কার যেন শয়নে-স্বপনে আমার মনের মধ্যে তন্ময়তা ঢালিয়া দিত।"

মুনশী মেহেরউল্লাহর বক্তৃতায় ছিল এক অসামান্য শক্তি। ছিল মন-মাতানো ঝংকার। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন :

"মুনশী সাহেবের বক্তৃতার যে একটি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল, প্রাণমাতানো তন্ময়তা ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই অনন্য

www.pathagar.com

দুর্লভ অঙ্গভঙ্গীর তুলনা হয় না; তাহাতেই সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে তিনি মধুর চাটনীর ন্যায় অতি মধুর সুরে ফারসী বয়াত আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সুরলহরীতে যেন চারদিকে অমিয়ধারা ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার বক্তৃতার ভাষাও বহুস্থলে অনুপ্রাস-অলঙ্কারপূর্ণ ছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি তাঁহার শ্রোতামণ্ডলীকে হাসাইতেন, কাঁদাইতেন। সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তির মন লইয়া তিনি যেন ছিনিমিনি খেলিতেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় লোকে নিখিল সংসার ভুলিয়া যাইত।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর বক্তৃতার যে অসাধারণ গুরুত্ব এবং আকর্ষণ ছিল, তার একটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি থেকে আমির উদ্দীন প্রধান এ বিষয়ে লিখেছেন :

"স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুনশী সাহেব মাগরিবের নামায অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা, ধর্মগতপ্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন প্রতিটি সভা বা মিলন মেলার প্রধান গোলাপ। সবার দৃষ্টি এবং মনোযোগ থাকতো কেবল তাঁর দিকেই। তাঁর ছিল এক সম্মোহনী শক্তি।

মুনশী মেহেরউল্লাহর অনেক দিকে যোগ্যতা ছিল। ছিল অনেক ধরনের পরিচিতি। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর বড় পরিচয় ছিল বাগ্মী হিসাবেই। তাঁর সেই অসাধারণ বাগ্মিতা এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তর্ক তো নয়, নাঙ্গা তলোয়ার

কেবল বক্তৃতা নয়। মুনশী মেহেরউল্লাহর অসম্ভব যোগ্যতা ছিল তর্কযুদ্ধেরও। ছিল শাণিত উপস্থিত বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির যুক্তিগুলো ছিল তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ।

জীবনে বহুবার তিনি খৃস্টান পাদ্রীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন তাদের মুখোমুখি হতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেকটি তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হতেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারতো না কোনো খৃস্টান পাদ্রী। কোনো কোনো ময়দান থেকে তারা পালিয়ে যেত অতি গোপনে।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ!

স্বল্প শিক্ষিত একজন মফস্বলের সাধারণ মানুষ।

কিন্তু বিস্ময়কর ছিল তাঁর মেধা এবং প্রতিভার শক্তি। আল্লাহ প্রদত্ত সেই শক্তির পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনে।

এখন আমরা মেহেরউল্লাহর উপস্থিত বুদ্ধি এবং তাঁর তর্কযুদ্ধের নমুনার সাথে কিছুটা পরিচিত হব।

১২৯৮ সনের কথা।

বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার [বর্তমান জেলা] খৃস্টান পাদ্রীরা এ সময়ে খুব উৎপাত শুরু করে দেয়। তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত করতে থাকে মুসলমানদের। সৃষ্টি করে কূট-কৌশলমূলক ধর্মীয় বিতর্ক। তারা যতসব মনগড়া বিতর্ক সৃষ্টি করে সেগুলো প্রচার করতো মুসলিম সমাজে। এ ধরনের একটি বিতর্ক ছিল আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সা]কে নিয়ে। তারা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতো :

www.pathagar.com

"মুসলমানরা তাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ [সা]কে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও মানব জাতির মুক্তির দিশারী বলে মনে করে। মুহাম্মাদ [সা] যদি আল্লাহর বন্ধুই হতেন, তাহলে কি কারবালার মহাসাগরে তাঁর পরিবারবর্গ, বিশেষ করে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হাসান-হোসাইনের বংশ এমনভাবে পর্যুদস্ত হতে পারে? মুহাম্মাদ [সা] যদি সত্যিই আল্লাহর বন্ধু ও রাসূল হতেন, তাহলে আল্লাহর আপন বন্ধুর প্রিয়তম দৌহিত্র ও তাঁদের বংশের এই করুণতম হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার না করে পারতেন কি? মুসলমানরাই বলেন, 'মুহাম্মাদ [সা] জীবনকালেই তাঁর দৌহিত্রদ্বয়ের, সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গের এই করুণ পরিণতির কথা জিবরীল কর্তৃক অবগত হয়েছিলেন।' তবে কি তিনি তাঁদের এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো অনুরোধ করেননি? আর করে থাকলেও আল্লাহ যে তাঁর সে প্রার্থনায় কোনো সাড়া দেননি, কারবালার দুর্ঘটনাই তার প্রমাণ। এর পরেও কি মুসলমানরা বলবেন, মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর বন্ধু [হাবীবুল্লাহ] ছিলেন?" [নাউজুবিল্লাহ]।

এ ধরনের আরও অনেক বানোয়াট প্রশ্ন রাখতো খৃস্টান পাদ্রীরা।

তাদের এসব জটিল ও উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব ছিল না সাধারণ কোনো মুসলমানের পক্ষে। এমনকি সেই সময়কার আলেম-উলামারাও ভড়কে যেতেন পাদ্রীদের প্রশ্ন শুনে।

মেহেরউল্লাহ!

একমাত্র মেহেরউল্লাহই সেদিন জবাব দিয়েছিলেন পাদ্রীদের। যেমন দিয়েছিলেন উপরের প্রশ্নটির জবাব।

পাদ্রীদের এই মনগড়া প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলো পিরোজপুরে একটি তর্ক-সভা।

তর্ক-সভায় উপস্থিত আছে বিজ্ঞ পাদ্রীরা। আর তাদেরকে জবাব দেবার জন্য উপস্থিত আছেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

পাদ্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ বলেন :

"আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারবর্গের প্রতি মমত্ববোধ

www.pathagar.com

করে পাদ্রী সাহেব সত্যিই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু আমরা বলি, পরের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তারা নিজেদের ঘরের কথা ভুলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ [সা] যখন এই দুঃসংবাদ আল্লাহর কাছে জানাতে গেলেন, আল্লাহ তায়ালা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, তুমি তো তোমার নাতি-নাতনীর কথা ভাবছো, এদিকে খৃস্টানরা যখন আমার পেয়ারা যীশুকে [যারা তাকে আমার পুত্র বলে] ক্রুশে বিঁধে মেরে ফেললো, আমি স্বয়ং খোদা হয়েই বা তার কি করতে পারলাম। পাদ্রী সাহেবরা আমার সমস্ত ক্ষমতাই কেড়ে নিয়েছে।"

সেদিন সেই সভায়– মুনশী মেহেরউল্লাহর কথা শেষ না হতেই দেখা গেল পাদ্রীদের চেয়ারগুলো শূন্য।

তারা ভয়ে পালিয়ে গেছে কখন, কেউ তা ঠিকও পায়নি।

সমকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক'-এ এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইসলাম প্রচারক'-এ লেখা হয় :

"পিরোজপুরের পাদ্রীরা এ স্পার্জন[?] সাহেবের সহিত মৌলবী ইব্রাহিম সাহেবের ধর্ম সম্বন্ধে এক তর্ক উপস্থিত হইলে একটি প্রকাশ্য সভায় উভয় পক্ষের প্রাধান্য রক্ষার প্রস্তাব সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ২১শে আশ্বিন, মোতাবেক ৩রা রবিউল আউয়াল, ইংরেজী ৭ই অক্টোবর তর্ক সভার দিন ধার্য হয়। নির্দিষ্ট তারিখে উভয়পক্ষ পিরোজপুর সমাগত হন।...

সর্বশ্রেণীর প্রায় ৩/৪ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ৩রা রবিউল আউয়াল বুধবার অপরাহ্ন ২টার সময় তর্ক উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যায় শেষ হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে পূর্বাহ্ন সাড়ে এগার, পরে আবার ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। শুক্রবার দিন প্রাতঃকাল হইতে ১১টা পর্যন্ত ক্রমাগত তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। খৃস্টান পক্ষই অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার করিয়া তাহার উত্তরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মুসলমান পক্ষ হইতে সুধাকর ও ইসলাম-প্রচারকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব তাঁহাদের প্রশ্নের অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ

www.pathagar.com

ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। মুনশী সাহেব পাদ্রী পক্ষের সকল প্রশ্নেরই সুন্দররূপে উত্তর দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষ সময় মুসলমান পক্ষ পাদ্রীগণকে প্রশ্ন করেন যে, হযরত ঈসা [আ] যে স্বয়ং খোদা তায়ালা, আপনারা একবার এ-কথার প্রমাণ প্রদর্শন করুন। পাদ্রীগণ তাঁহাকে খোদা বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিয়া অগত্যা মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। শেষে পাদ্রীরা আর এ স্পার্জন, পাদ্রী হাসান আলী ও পাদ্রী ঈশান মণ্ডল 'আমাদের আর সময় নাই, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদিগকে ক্ষমা করুন' এই কথা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তর্ক সভার কার্য শেষ হয়।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর ছিল অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য হতো বড় বড় পণ্ডিত পাদ্রী। এখানে মাত্র খণ্ডাংশ উপস্থিত করছি। এর মধ্য দিয়েই মেহেরউল্লাহর বুদ্ধির প্রখরতা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

একবার এক পাদ্রী মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলো– 'আপনাদের ধর্মে কতকগুলো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে। অন্তত এই বিজ্ঞানের যুগে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।'

মুনশী মেহেরউল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'অর্থাৎ? আপনি কি বলতে চান? স্পষ্ট করে বলুন।'

পাদ্রী বললো, 'এই ধরুন, ফুঁ-এ বিশ্বাস।'

মেহেরউল্লাহ তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফুঁ-এ বিশ্বাস? তার মানে?'

পাদ্রী জবাব দিল, 'এই যেমন পানি পড়া, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস! পানি পড়াতে কি রোগ সারে?'

পাদ্রীর কথা শেষ হতেই মেহেরউল্লাহ কৃত্রিম ধমকের সাথে বললেন, 'কি বললি বেআদব? এই কে আছিস? দে তো পাদ্রীকে...'

মেহেরউল্লাহর আকস্মিক এ ধরনের রূঢ় ব্যবহারে পাদ্রী তো হতবাক।

www.pathagar.com

উপস্থিত সকলেই তাকিয়ে আছে মেহেরউল্লাহর দিকে। তার সাথীরা তো জানে, মেহেরউল্লাহর এই আচরণের মধ্যেও হয়তো বা কোনো উপস্থিত জবাব লুকিয়ে আছে। ফলে তারা সবাই চুপচাপ।

কিন্তু পাদ্রী বেচারা খুবই মর্মাহত। কম কথা নয়! এতগুলো মানুষের সামনে তাকে বেআদব বলা হলো। অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করছে পাদ্রী। না, আর এখানে এক মুহূর্তও বসে থাকা যায় না। মুখ লাল করে উঠে দাঁড়ালো পাদ্রী।

পাদ্রীকে উঠতে দেখেই মেহেরউল্লাহ থামালেন তাকে। তারপর কেমন স্বাভাবিক হেসে বললেন, 'কি পাদ্রী সাহেব, আমার কথায় কি ব্যথা পেয়েছেন?'

স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগলো পাদ্রীর। তারপর ধরা গলায় বললো, 'আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আপনার মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে এ ধরনের আচরণ আশা করিনি।'

মেহেরউল্লাহ হেসে বললেন, 'আপনি অপমানিত হয়েছেন? বলেন কি? আমার একটি ছোট্ট কথায় আপনি এত উত্তেজিত হয়েছেন যে, পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখন ভাবুন তো, করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর পবিত্র নাম স্মরণ করে যদি রোগীর ওপর ফুঁ দেই, তাহলে রোগ তো রোগ, রোগের বাবাও কি না পালিয়ে পারে?'

পাদ্রী এবার হার মানলো। বললো, 'সতিই, আপনার কথাই ঠিক। কথার দাহ্য শক্তি আছে।'

www.pathagar.com

গল্পের ছলে সত্য ছোঁয়া

কে শ্রেষ্ঠ, যীশু না মুহাম্মাদ [সা]?

একবার এক পাদ্রী বললো, "প্রভু যীশু যে শ্রেষ্ঠ তা তো চৌঠা আসমানে উঠে যাওয়া থেকেই বুঝা যায়। সারবান এবং মূল্যবান বস্তুকে মালিক চিরদিনই উচ্চে স্থান দিয়ে থাকেন এবং সযত্নে রক্ষা করেন। প্রভু যীশুকে তাই তাঁর পিতা 'গড' নিজের কাছেই তুলে নিয়েছেন।

অপরদিকে নবী মুহাম্মদকে এই দুনিয়ার না-পাক মাটিতেই পুঁতে রাখা হয়েছে। তাহলে কে শ্রেষ্ঠ, তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে কি?"

পাদ্রীর যুক্তিটা ভয়ংকর। কিন্তু এতটুকুও ঘাবড়ে গেলেন না মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

পাদ্রীর জবাবে এবার তিনি বললেন, "আমাদের ধারণা কিন্তু উল্টো। আমরা জানি, সারবান বস্তু ভারীই হয়। তা হাওয়ায় উড়ে যাবার মতো বস্তু নয়। এটি আধুনিক বিজ্ঞানেরই কথা। পক্ষান্তরে ফাঁপা এবং হালকা জিনিসই হাওয়ায় উড়ে যায়। যেমন : বেলুন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আপনাদের যীশু হালকা জিনিস বলে হাওয়ায় উড়ে গেলেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদকে [সা] সযত্নে মাটিতে রাখা হয়েছে। আর তাছাড়া আখেরী নবী তাঁর উম্মতদেরকে অনেক ভালবাসেন কি না, তাই তাদের ফেলে চৌথা আসমানে যেতে রাজী হননি। এ থেকেই এবার বুঝে নিন, কে শ্রেষ্ঠ!"

জানা যায়, পাদ্রীর এই প্রশ্নের জবাব মেহেরউল্লাহ অন্যভাবেও দিয়েছিলেন। সেই জবাবটি ছিল খুবই মজাদার। যেমন মেহেরউল্লাহ পাদ্রীকে জবাব দেবার জন্য বলেছিলেন :

"দুই শ্রেণীর মুরগী আছে। এক জাতের মুরগী আছে– যারা শক্রচিল দেখা দিলে বাচ্চাগুলোকে সযত্নে ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে। এভাবে

www.pathagar.com

মুরগীটি তার বাচ্চাদেরকে রক্ষা করে। মুরগীর কৌশলের কারণেই শত্রু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

আর এক জাতের মুরগী আছে। যারা চিল বা বাজপাখি দেখলেই 'কট্ কট্ কট্' করে তার পেছন পেছন ছুটে যায়। অথবা গাছে বা ঘরের চালে আশ্রয় নেয়। এই ফাঁকে চিল বাচ্চাগুলিকে একটি একটি করে ধরে নিয়ে যায়। বেচারী তার বাচ্চাগুলিকেও রক্ষা করতে পারে না।

আপনাদের প্রভু যীশু করেছেন শেষোক্ত মুরগীর মতো ব্যবহার। নিজের মুক্তির জন্যই তিনি কেবল ব্যাকুল এবং পাগল। সুতরাং বাচ্চাদের কথা ভাববেন কখন?

আর দেখুন আমাদের নবীকে [সা]। দরদী মায়ের মত তিনি বাচ্চাদেরকে নিজের ডানার নিচে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন।"

একেই বলে, যেমন প্রশ্ন তেমনি তার জওয়াব।

পাকজাত আল্লাহ্ তাআলা প্রসঙ্গে

একবার পাদ্রী বললো, "আপনাদের আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সকল জায়গায় বিরাজমান। একথা তো আপনারাই বলেন। তাই যদি হয়, তাহলে তো তিনি সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, সবার মধ্যেই আছেন।"

পাদ্রীর জবাবে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ বললেন, "হ্যা। আল্লাহ পাক সবকিছুর মধ্যে আছেন। সবার মধ্যেই আছেন।"

পাদ্রী : তিনি তাহলে মল-মূত্রের মধ্যেও আছেন?

মুনশী : হ্যা, আছেন।

পাদ্রী : মল-মূত্র তো নাপাক। যিনি নাপাকির মধ্যে আছেন, তিনি তো নাপাক হয়ে যান। তাহলে আল্লাহও কি নাপাক হয়ে গেলেন না?

মুনশী : না, আল্লাহ নাপাক হন না। কারণ, তিনিতো জাতপাক। নাপাকি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

পাদ্রী : এর কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন?

মুনশী : প্রমাণ? প্রমাণ আছে। বাস্তবে দেখতে চান নাকি শুনতে চান?

পাদ্রী : দেখতে পারলে আর শুনতে চায় কে, বলুন।

www.pathagar.com

মুনশী : শুনতে চাইলে এখনিই শুনাতে পারি। আর যদি প্রমাণটা দেখতে চান, তাহলে কিছুটা সময় দিতে হবে।

পাদ্রী : আমি বাস্তবে দেখতে চাই।

মুনশী : ঠিক আছে। তাহলে আগামীকাল একবার আসুন। প্রমাণটা বাস্তবেই দেখিয়ে দেব।

পরদিন।

বিকাল চারটায় পাদ্রীসহ সবাই হাজির।

কিন্তু মুনশী মেহেরউল্লাহর কোনো পাত্তা নেই।

মুনশী সাহেবের দেখা না পেয়ে পাদ্রীর তো আর আনন্দের সীমা নেই। সে বিজয়ীর বেশে লাফালাফি শুরু করে দিল। ভাবছে– আসবেন কেন? যে প্রশ্ন তাকে করেছি, তার জবাব দেয়া অতো সোজা নয়। তার সাধ্যেই কুলাবে না!

সময় গড়ায়।

পাদ্রীর আস্‌ফালনও বেড়ে যায়।

এরই মধ্যে হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাজির হলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

মেহেরউল্লাহর সাথে আছে আর একজন সাথী।

তার মাথায় একটি হাঁড়ি। হাঁড়িটার মুখ বন্ধ।

মুনশী সাহেব নির্দেশ দিলেন সাথীকে, হাঁড়িটা নামিয়ে রাখুন।

হাঁড়ির মুখ বন্ধ দেখে পাদ্রী অবাক হলো। জিজ্ঞেস করলো, হাঁড়ির ভেতর কি আছে?

মেহেরউল্লাহ বললেন, আপনার প্রশ্নের জবাব। হাঁড়ির মধ্যে আপনার প্রশ্নের জবাব এনেছি। দেখে নিন।

মেহেরউল্লাহর কথা শেষ হতেই পাদ্রী দ্রুত হাতে হাঁড়ির মুখটি খুলে ফেললো। তারপর হাঁড়ির মধ্যে তাকিয়ে বললো, এতে পানি ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে!

মুনশী : কিছুই না?

www.pathagar.com

পাদ্রী : হ্যা, আর দেখতে পাচ্ছি কেবল ঐ পানিতে আমারই মুখ। কিন্তু এর ভেতর আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়?

মুনশী : আছে, আছে। ওর ভেতরেই আপনার প্রশ্নের জবাব আছে।

পাদ্রী : আমার সাথে তামাশা করছেন? আমিতো হাঁড়ির পরিষ্কার পানিতে কেবল আমার মুখটাই দেখতে পাচ্ছি।

মুনশী : ওইতো। ওর মধ্যেই তো আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

পাদ্রী : আমার সাথে কি সব মশকরা করছেন?

মুনশী : মশকরা নয়। ঠিকই বলেছি। এবার যান, ঐ যে নতুন সাবান দেখতে পাচ্ছেন, ওটা দিয়ে ভাল করে আপনার মুখখানা ধুয়ে আসুন।

পাদ্রী : কেন? সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হবে কেন?

মুনশী : মুখ ধুতে হবে। কারণ, ঐ হাঁড়িতে একেবারে সদ্যকৃত টাটকা পেশাব রাখা হয়েছে। সেই পেশাবের মধ্যে আপনার মুখ দেখেছেন। সুতরাং আপনার মুখটাও নোংরা এবং নাপাক হয়ে গেছে। যান, এবার ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে আসুন।

পাদ্রী : বাহ্! কি তামাশা! পেশাবের মধ্যে আমার মুখ দেখেছি বলেই কি মুখটা অপবিত্র হয়ে যাবে?

মুনশী : নিশ্চয়ই। কেন নয়? আপনিই তো বলেছেন, পেশাবের মধ্যে আল্লাহ থাকলে তিনি নাপাক হয়ে যাবেন। তিনি যদি নাপাক হন, তাহলে আপনার মুখ পেশাবের মধ্যে থাকার কারণে সেটাও তো নাপাক হয়ে গেছে। কি, ঠিক বলেছি না?

মুনশী মেহেরউল্লাহর কথার কোনো জবাব দিতে পারলো না পাদ্রী। সে কেবল পরাজিত সৈনিকের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো মেহেরউল্লাহর দিকে।

মেহেরউল্লাহ বললেন, "দেখুন পাদ্রী সাহেব! পাকজাত মহান রাব্বুল-আলামীন আল্লাহ সকল সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে বিস্তার করে রেখেছেন। সবখানেই তিনি আছেন। সবকিছুর মধ্যে থেকেও তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। প্রকৃত চোখ নেই বলে আমরা দেখতে পাইনে। আর সেই জন্যই বেধে যায় যত্তসব গণ্ডগোল।"

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

মেহেরউল্লাহর মজার গল্প

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর ছিল নানামুখি প্রতিভা।

তাঁর অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি ছিল লেখনীর যোগ্যতাও।

তিনি কবিতা লিখেছেন। প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। সেই সাথে তিনি অনেক সরস গল্পেরও জনক। তাঁর বহু গল্প এখনও গ্রাম-গঞ্জে বহুল পরিচিত। তাঁর প্রতিটি গল্পেই রয়েছে শিক্ষার দ্যুতি। গল্পের মাধ্যমে তিনি অনায়াসে ব্যক্ত করেছেন শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়-আশয়।

কবি হবিবর রহমানের 'হাসির গল্প', 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' এবং 'শয়তানের সভা' প্রভৃতি গ্রন্থে মেহেরউল্লাহর বেশ কিছু গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর কয়েকটি চমৎকার গল্পের সাথে পরিচিত হবো। নিচের 'পাখি বলে কি' গল্পটি খুলনা জেলার দৌলতপুর মহসিন স্কুলের সামনে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বলেছিলেন। সময়টা ছিল ১৩০৬/১৮৯৯।

পাখি বলে কি?

একটি পাখি গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে গান করছে। দুই পথিক তার গান শুনে দু'রকমের অর্থ করলো। প্রথমজনের মতে, পাখিটি তার স্বদেশের 'বদরক' শহরের গুণগান করছে। লোকটির বাড়ি সেই শহরে। বেচারা অনেকদিন বাড়ি যায়নি। পাখির গান শুনে তার স্বদেশের কথা মনে হয়েছে, তাই সে পাখির গানে নিজের দেশের মাহাত্ম্য শুনে আশ্চর্য হয়েছে।

সে বললো, পাখিটি বলছে, 'আজব শহরে বদরক।' মানে– বদরক শহরটি বড় আশ্চর্য!

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পথিক প্রতিবাদ করে বললো, যত সব বাজে কথা! পাখিটি বলছে, 'পিঁয়াজ, লহ্সুন আদরক'। মানে– পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা।

বেচারা পেঁয়াজ, রসুন, আদার ব্যাপারী। তার জাহাজের খবরের দরকার কি? সে তাই পাখির গানে নিজের সুখ-দুঃখের চিত্র আঁকছে। তার মনে-প্রাণে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ছাড়া আর কিছু নেই।

কিন্তু প্রথম পথিকও ছাড়বার পাত্র নয়। সে দ্বিতীয় জনকে 'আজব শহরে বদরক' শুনিয়েই ছাড়বে।

দ্বিতীয় পথিকও মানতে রাজি নয় যে সে ভুল শুনেছে।

দু'জনের মধ্যে এনিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

এমন সময় এক দরবেশ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে প্রথম পথিক বললো, 'এইতো বেশ হলো, এই দরবেশ সাহেবকে বলা যাক। তিনি নিশ্চিয়ই এর একটা সুষ্ঠু বিচার করবেন'।

ঘটনা শুনে তো দরবেশের চক্ষু ছানাবড়া! অকস্মাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়– 'সুবহান তেরি কুদরত!' মানে– হে আল্লাহ, তোমার মহিমার কোনো শেষ নেই। [মতান্তরে দরবেশের কথাটা ছিল– 'আজব খোদাকা কুদরত'। অর্থ একই]

পাখি কি বলে আর লোকে কি শোনে?

বলতে বলতে দরবেশ চলে গেলেন। কারো কোনো প্রশ্নেরই তিনি আর জবাব দিলেন না।

প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

প্রকৃত অর্থে, আমরা পাখির ভাষা কেউ বুঝি না। কিন্তু আমরা পাখির ভাষা থেকে নিজের মনের ভাষা খুঁজে নিই।

নানা-নাতি সংবাদ

নানার সাথে নাতি গেছে ওয়াজ শুনতে।

মৌলবী সাহেব খুব করে ওয়াজ করলেন। দেশের উন্নতি, আত্মার উন্নতি, দশের উন্নতি ইত্যাদি কত কথাই না তিনি বললেন।

নানার মত নাতিও মৌলবী সাহেবের ওয়াজ শুনে উদ্বুদ্ধ হলো।

www.pathagar.com

ওয়াজ শুনতে শুনতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলায় তারা বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। পথে একটি ছোট্ট খাল। খালে পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই, অবশ্য খালটাও তেমন বড় নয়।

নানা কোমর বেঁধে অনেকটা কাপড় তুলে খালের ওপারে গিয়ে দেখেন নাতি সাথে নেই। কি ব্যাপার! সে খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে।

নানা বিরক্ত হয়ে বললো, কি রে। এত দেরি কেন? চলে আয়!

নাতি ব্যাকুল হয়ে বললো, ছতর যে আলগা হয়ে যাচ্ছে! মৌলবী সাহেব যে বললেন, ছতর আলগা হলে গুনাহ হয়!

নানা রেগে বললেন, আরে রাখ তোর ওয়াজ! খাল পার হতে গেলে অমন ছতর 'আলগা' হয়েই থাকে!

নাতি তো শুনতেই চায় না। মৌলবী সাহেব এ ব্যাপারে খুব তাকিদ দিয়েছেন।

নাতির কথা শুনে নানা রেগে বললো, আরে নতুন মুনশী সাহেব, চলে আয় দাদা, চলে আয়।

নাতি বললো, গুনাহ হবে যে!

নানা বললো, ভারি তো একদিন ওয়াজ শুনতে গেছো! আমার বয়স প্রায় আশি হয়ে গেল। ওয়াজ শুনতেই আছি। একদিনও সে ওয়াজ খাল পার করিনি!

[গল্পটি এখনও গ্রামে-গঞ্জে বহুল পরিচিত। অনেকে ওয়াজ করার সময় মেহেরউল্লাহর এই গল্পটি খুব রসিয়ে রসিয়ে বলেন।]

বিভেদের কুফল

একজন ব্রাহ্মণ, একজন নমঃশূদ্র এবং একজন মুসলমান এক মুসলমানের আখের ক্ষেতে গিয়ে চুরি করে আখ খাচ্ছিল। হঠাৎ ক্ষেতের মালিক সেখানে এসে তাদেরকে দেখতে পেল। সে ভাবলো, একা এদের সাথে পারবে না। অতএব এরা যাতে একতাবদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য সে একটি কৌশল অবলম্বন করলো।

ক্ষেতের মালিক বললো, ব্রাহ্মণ হিন্দু জাতির দেবতাস্বরূপ। তিনি আমার ক্ষেতের একখান আখ খেয়েছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

www.pathagar.com

মুসলমান আমার জাত ভাই। তিনি যদি আমার সামান্য আখ খেয়ে থাকেন তাতেই আমার এমন কি ক্ষতি হয়েছে? কিন্তু বেটা নমঃশূদ্র, ছোটলোক, তুই কেন আমার আখ খেয়েছিস? বলেই সে নমঃশূদ্রকে মারতে শুরু করলো। বেচারা নমঃশূদ্র আধমরা হয়ে গেল।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল। এবার চতুর কৃষকটি ব্রাহ্মণকে বললো, বেটা চোর ছুঁচো! তুই হিন্দুর বামন, আমার কি? ইনি আমার স্বজাতি। একে না হয় আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু তোকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বো না। এই বলে সে ব্রাহ্মণকে এবার মারলো।

তাকে মারার সময় মুসলমানটি আনন্দে এবং গৌরবে হাসছিল।

ক্ষেতের মালিক এবার মুসলমানটির গলা চেপে ধরে বললো, বেটা বেঈমান চোর-বদমাশ! তুই মুসলমান হয়ে চুরি করিস? এই বলে তাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেললো।

সবুরে মেওয়া ফলে

রাজবাড়িতে গানের জলসা বসেছে।

গান তেমন জমছে না। ফলে গায়েনদের পাওনা বখশিশ তেমন মিলছে না। অথচ রাতও শেষ হয়ে এসেছে।

প্রধান গায়েন প্রমাদ গুনছেন, যে অবস্থা– মহারাজকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে বায়নার টাকা পাওয়াও কঠিন হতে পারে। এদিকে দোহার দলও উৎসাহ পাচ্ছে না। এখন উপায়?

প্রধান বয়াতী কৌশলে এমন একটি গান ধরলেন, যার অর্থ– আর একটু ধৈর্য ধরে গান করো। রাত তো শেষ হয়েই এসেছে। মানে, সবুরে মেওয়া ফলে।

এতে প্রার্থিত ফল ফললো। রাজকন্যা উৎসাহিত হয়ে বয়াতীকে গলার মোতির মালা উপহার দিলেন। রাজপুত্র দিলেন প্রচুর টাকা। কিন্তু কোটালপুত্র এক কাণ্ড করে বসলো। সে করলো কি, তার বাপ কোটালকে দিল একটি চড় বসিয়ে। বেচারা কোটাল দিশা না পেয়ে ছেলেকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলো। মহারাজ এই

www.pathagar.com

কাণ্ড-কারখানা দেখে এমনি বিরক্ত হলেন যে, জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়ে পুরস্কারদাতাদের এই কাণ্ড-কারখানার জন্য প্রকাশ্য দরবারে বিচার হবে বলে ঘোষণা করলেন।

তিনি ভাবলেন, এক অপদার্থ কবিকে এরূপ পুরস্কৃত করে এরা রাজ-দরবারের অসম্মান করেছে, এমন অপকর্মের জন্য উদাহরণযোগ্য শাস্তি দেওয়া উচিত।

পরদিন প্রকাশ্য দরবারে রাজকন্যা, রাজপুত্র, কোটালপুত্র ও কোটালের বিচারের কথা ঘোষণা করা হলো। কৌতূহলী জনতা এই অদ্ভূত বিচার দেখার জন্য সমবেত হলো।

প্রথমে রাজকন্যা।

মহারাজ বললেন, 'তুমি অবিবাহিতা রাজকন্যা। নিজের গলার মূল্যবান মালা অন্য পুরুষকে উপহার দেয়ার অর্থ সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার জানা থাকার কথা। তাও আবার এক অপদার্থ কবিকে। যার গানের কোনো মানেই হয় না।'

রাজকন্যা জোড় হাতে বললেন, 'আপনি রাজা দেশের ভাগ্য-বিধাতা। আপনি ন্যায় বিচার করুন। তবে যদি অভয় দেন, আমার কথা বলতে পারি।'

মহারাজ বললেন, 'বলো। অভয় দিলাম।'

রাজকন্যা বললেন, আজই রাত্রিশেষে গৃহত্যাগের সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু কবির গানের শেষে যখন আরও একটু সবর করে মেওয়া প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হলো– মনে হলো, সত্যিই তো।... এই ভেবে এত বড় একটা পাপ কাজ থেকে বিরত হলাম। ভাবলাম, এত বড় একটি মূল্যবান উপদেশ যিনি গানের মাধ্যমে আমাকে দিলেন, তাকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। কিন্তু কোনো উপযুক্ত পুরস্কার হাতের কাছে না পাওয়ায় গলার মালাটি খুশিতে কবির জন্য উপহার দিলাম। বলুন, কোনো অন্যায় করেছি কি?

মহারাজ মাথা নিচু করলেন। বললেন, 'না না, আমাদেরই হিসাব করা উচিত ছিল। যাই হোক, এখন উপযুক্ত শিক্ষা হলো।'

www.pathagar.com

এবার যুবরাজের পালা।

যুবরাজ অভয় নিয়ে বললেন, 'আপনি রাজা, আমি যুবরাজ। আমারও রাজা হওয়ার শখ জেগেছিল। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। এ সময় বানপ্রস্থ নেবার সময় আপনার। কিন্তু আপনি তা না করে আমার পথের কাঁটা হয়ে রয়েছেন। তাই সংকল্প করেছিলাম, আপনাকে আজ রাতশেষেই হত্যা করে সিংহাসন দখল করার। কিন্তু কবির গানের উপদেশ পেয়ে আমিও আমার সংকল্প ত্যাগ করে পিতৃ ও রাজহত্যার কলঙ্কপ্রাপ্তি থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলাম। তারই পুরস্কারস্বরূপ কবিকে এরূপ উপহার দিলাম। বলুন, কোনো অন্যায় করেছি কি?'

রাজা বললেন, 'না বাছা! অপরাধ আমারই হয়েছিল। রাজ্যের লোভে পুত্রের অধিকার আদায়ে শৈথিল্য করেছি। তুমি যথার্থ কাজই করেছো।"

কোটালপুত্রের অদ্ভুত কাজের কৈফিয়ত তলব করলেন রাজা। রাজপুত্র ও রাজকন্যা পিতৃহত্যা ও পিতৃকলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। আর কোটালপুত্র সেই পিতাকে প্রকাশ্য রাজ-সভায় অপমানিত করেছে। সকলেই ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো।

কোটালপুত্রও রাজার কাছে অভয় প্রার্থনা করলো। বললো, 'মহারাজ! গোস্তাখি মাফ করুন। আমি নিতান্তই মূর্খ। বাপ আমাকে বিদ্যা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা না করায় আমি নিতান্তই মূর্খ হয়ে জীবন যাপন করছি। তাই যখন রাজপুত্র ও রাজকন্যা খুশি হয়ে কবিকে বিশেষ উপহার দিলেন, আমার মনে হলো, কবি নিশ্চয়ই তার গানে এমন কোনো মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, যা বুঝে রাজপুত্র ও রাজকন্যা এমন মূল্যবান উপহার দিলেন। আমিও যদি তাদের মত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারতাম, তাহলে আমিও এই বিমল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম না। তাই যে পিতা আমাকে মূর্খ করে রেখেছেন, তার উপরে আমার রাগ হলো। তাই সভার মধ্যেই তাকে মারতে উদ্যত হলাম।

এবার মহারাজ তার কোটালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবং কোটাল, তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পার।'

www.pathagar.com

কোটাল বললেন, 'মহারাজ! আমি আর কি বলবো। আমার ছেলে যে রকম গুন্ডা হয়ে আছে, তাতে ওযে আমাকে একেবারে খুন করে ফেলেনি, শুধুমাত্র একটি চড় দিয়ে থেমে গেছে, তাতেই আমি খুশি হয়ে তাকে আদর করেছি। এজন্য অপরাধ হয়ে থাকলে মহারাজ যে শাস্তিই দেন, মেনে নিতে রাজি আছি।'

ভূতের মিলাদ মাহফিল

একবার ভূতেরা ঠিক করলো তাদের জাতীয় কল্যাণে দেশীয় মুসলমানদের মতো মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু ভূতদের তো মোল্লা-মৌলবী নেই। এখন উপায়? তারা ঠিক করলো, মুসলমান পাড়া থেকে একজন মোল্লাকে দাওয়াত দিতে হবে।

তারা কয়েকজন মিলে এক মোল্লা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির। মোল্লা সাহেব তো ভয়ে অস্থির। 'যাবো', একথা যেমন বলা কঠিন, আবার 'যাবো না' বলাও তেমনি দুরূহ। এখন উপায়?

অবশেষে মোল্লা সাহেবের মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। তিনি ভূতদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের দাওয়াত তো কবুল করবো, কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কে দাওয়াত দিচ্ছো?

সকলেই বললো, 'আমি', 'আমি'।

মোল্লা বললেন, 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের নেতার দাওয়াত ছাড়া তো মিলাদে যাওয়া যায় না। এক কাজ করো, আগে মিলাদ কমিটি করে একজন নেতা ঠিক করে এসো, তারপর আমি যাবো।'

মোল্লাজির কথায় ভূতেরা ফিরে গিয়ে গ্রাম-প্রান্তের এক মাঠে সভা করে বসলো।

নেতা ঠিক করবে কি, তারা প্রত্যেকেই নিজেকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা বলে ঘোষণা করলো।

তাদের মধ্যে কেউ-ই নিজেকে ছোট মানতে রাজি হলো না। অতএব নানা আচার-বিচারের কথা উঠলো। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৌলিন্য ইত্যাদি নিয়েও মহা শোরগোল বেধে গেল।

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে হাতাহাতি, কিলাকিলি, চুলোচুলি, মারামারি, কাটাকাটি চললো। শেষ পর্যন্ত বড় বড় গাছ উপড়ে নিয়ে তারা এমন মহাসমর শুরু করে দিল যে, ভূতের বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইলো না। মোল্লা সাহেবও ভূতের হাত থেকে চিরতরে রক্ষা পেলেন।

জাতীয় নেতার অভাবে দেশের কতটা দুর্দশা হতে পারে ওপরের গল্পটিতে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সেই কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

কালুর মায়ের স্বামীভক্তি

গ্রামের বউ 'কালুর মা' ওয়াজ শুনতে গেছে।

সবে এক ছেলের মা, তাই তাকে আদর করে কালুর মা বলে সবাই ডাকে। কালুর মাও ছেলের বাপকে 'কালুর বাপ' বলে ডাকে।

স্বামীর নাম ধরে তো আর ডাকা যায় না! কালুর মাও তাই সাবধান হয়ে যায়।

কিন্তু ওয়াজ শুনে কালুর মায়ের মনটা গেল বিগড়ে। মুনশী সাহেব ওয়াজে বলেছেন, স্বামীর সেবা করা ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো কাজ নেই।

স্বামীর সেবা? সেবা জিনিসটা কি, কালুর মা ঠিক তা বুঝে উঠতে পারছে না।

মুনশী সাহেব বলেছেন, আল্লাহ নাকি বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া যদি আর কাউকে সিজদা করতে বলা হতো, তাহলে স্ত্রীকে বলা হতো স্বামীকে সিজদা করতে।'

বাপরে বাপ! আল্লাহর সেবার পর স্বামীর সেবা! আল্লাহর সেবা তো নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি। আর স্বামীর সেবা?

কালুর মা মুশকিলে পড়ে যায়।

কালুর মা প্রতিজ্ঞা করেছে, স্বামীকে সেবার মত সেবা করবে। এত বড় মর্তবা যার, স্বয়ং খোদা তায়ালার পরে যার স্থান, তার সেবা কি আর সহজ!

আজ ভোর থেকে কালুর মা নতুন করে স্বামীর সেবায় লেগেছে।

www.pathagar.com

ফজরের নামাজ শেষ করে কালুর মা তসবিহ তেলাওয়াত করে থাকে। কালুর মা লেখা-পড়া জানে না। তেলাওয়াতের মর্মও সে বোঝে না। গ্রামের আখুঞ্জী সাহেব বলেছেন, নামাজের পর 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে তসবিহ ঘোরালেই হবে। আল্লাহর নাম করলেই আল্লাহর সেবা হবে।

কালুর মার মাথায় নতুন বুদ্ধি খেলে যায়। সে আজ আল্লাহ নাম জপের পরে কালুর বাপের নাম জপ করবে :

'কালুর বাপ', 'কালুর বাপ', কালুর বাপ'...।

কালুর মায়ের জপ আর থামে না।

এদিকে কালুর বাপ লাঙল নিয়ে মাঠে যাবে। সকাল বেলার 'জাউ' (নাশতা) রাঁধা হয়নি। কালুর বাপ তাই তাকিদ দিচ্ছে। কালুর মা বিরক্ত হয়ে বলে, 'সকাল বেলায় চেঁচামেচি করো না দেখি, তোমার নাম জপটা শেষ করে নিই!'

কালুর বাপের নাম জপ? সে আবার কি?

কালুর বাপ এর মানে বোঝে না!

কালুর বাপের সেবা মানে কি নাম জপ করা?

কালুর বাপ তেড়ে ওঠে, 'ওসব রাখো, আমার নাশতা কই?'

কালুর মাও তেড়ে ওঠে, 'এখন থামো, তেলাওয়াতটা শেষ করে নিই।'

দু'জনের মধ্যে বেধে যায় তুমুল ঝগড়া। এর মীমাংসা কি হবে? মুনশী সাহেবকে ডাকা হলো। তিনিই দেবেন এর মসলা। কালুর মা স্বামীর ঘর-কন্নার কাজ বাদ দিয়ে কালুর বাপের নাম জপ করলে স্বামীর সেবা হবে কি না?

মুনশী মেহেরউল্লাহর প্রতিটি গল্প এভাবেই শিক্ষার আলো বহন করে চলে। এই গল্পে যেমন আমরা জানলাম, কেবল কথায় সেবা হয় না, বরং প্রকৃত সেবা হয় কাজের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের সীমানায়

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

অসাধারণ ছিল তাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ।

সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, বাগ্মী হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে। প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে।

কিন্তু এতসব পরিচিতির বাইরে আর একটি পরিচিতি ছিল তাঁর– লেখক হিসাবে।

না, মেহেরউল্লাহ লেখেননি খ্যাতির জন্যে। লেখেননি অর্থ উপার্জন কিংবা পুরস্কারের লোভে। তিনি লিখেছেন কেবল স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণে রেখে। লিখেছেন– তাদেরকে জাগানোর জন্যে। তাঁর মুখ থেকেই শুনা যাক কিছুটা। তিনি বলছেন :

"যদিও আমি ভাল বাঙলা জানি না, তথাপি আমি কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্রলোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

মেহেরউল্লাহর ওপরের বক্তব্যে যতটুকু না সত্য ফুটে উঠেছে, তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর বিনয়। কেননা আমরা অন্তত এতটুকু জানি যে, মুনশী মেহেরউল্লাহ লিখে কিংবা বই-পুস্তক প্রকাশ করে কোন দিনও প্রচুর অর্থের মালিক হননি। বরং অর্থকষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

www.pathagar.com

কিন্তু মেহেরউল্লাহর বিশেষত্ব ঐখানে, যেখানে তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে সম্পূর্ণ ছিলেন উদাসীন এবং বলতে গেলে কপর্দকহীন থেকেও নিজেকে মনে করতেন প্রাচুর্যের মালিক। মনে করতেন নিজেকে সুখি মানুষ।

হৃদয়ের প্রাচুর্য না থাকলে কি আর এমনটি ভাবা সম্ভব? নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর আর একটি বিনয়ী উচ্চারণ :

"আমি ভাষাবিদ পণ্ডিত নহি, নিজ মনের সামান্য ভাব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতেই যখন শতবার ঘুরপাক খাইতে হয়, তখন অন্যের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হওয়ার আশা করাও বালকত্বের পরিচয় দেওয়া মাত্র। তবে আমি কোন বলে ও কোন সাহসে ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম? দেখিয়াছি, বালকেরা যখন কোন মনোভাব ব্যক্তকরণ মানসে অস্ফুট ও অসম্পূর্ণ দু'একটি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত মনোভাব বুঝিয়া লয়েন, আমারও সম্বল সেই অসম্পূর্ণ ভাষামাত্র!"

বিস্ময়করই বটে!

মেহেরউল্লাহ নিজের লেখা সম্পর্কে যত 'বালকসুলভ' কাজই মনে করুন না কেন, আসলে সেসব গ্রন্থ যে আদৌ বালক-রচিত নয়– সেকথা বলাই বাহুল্য। বরং আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, মেহেরউল্লাহর প্রতিটি গ্রন্থ, প্রতিটি লেখাই একটি উদ্দেশ্য বহন করে চলেছে। উদ্দেশ্যহীন পথিকের মত তাঁর সাহিত্যযাত্রা উদ্দেশ্যহীন ছিল না বিন্দুমাত্রও।

আমরা জানি, মেহেরউল্লাহ সমাজ সংস্কারের কাজে ও ইসলাম প্রচারের কাজে ভীষণ ব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন।

রাতদিন তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। লেখার জন্যে যে সময় বা অবকাশের দরকার– তা তাঁর জীবনে ছিল না বললেই চলে। তবু তিনি শত কাজের মধ্যে লিখেছেন। লিখেছেন শত ব্যস্ততার মধ্যেও।

খুব সংক্ষিপ্ত ছিল তাঁর জীবনকাল। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে নানাবিধ

www.pathagar.com

কাজের মধ্যে যা লিখেছেন, তার পরিমাণও নেহায়েত কম নয়। তাঁর প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকাটির দিকে দৃষ্টি দিলে রীতিমত হতবাক হতে হয়। যেমন :

১. খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা [প্রকাশকাল : ১২৯৩/১৮৮৬];

২. রদ্দে খ্রীষ্টান [১৩০২/১৮৯৫];

৩. রদ্দে খ্রীষ্টান ও দলিলোল এসলাম [প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে শুধু 'রদ্দে খ্রীষ্টান' নামে প্রকাশিত হয়, পরে একত্রে বর্তমান নামে প্রকাশিত হয়];

৪. মেহেরুল এছলাম [১৩০২/১৮৯৫];

৫. বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার [১৩০৭/১৯০০ সালের আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশের অপরাধে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র মনসুর আহমদের দুশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিনমাসের কারাদণ্ডের পরে বহু বছর যাবত এটা অপ্রকাশিত ছিল। এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৭৫/১৯৮৬ সালে এবং সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৯৭ সালে];

৭. পন্দেনামা। ফারসী কবি শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের পান্দেনামা কাব্যের পদ্যানুবাদ [২য় সংস্করণ ১৯০৮];

৮. জোওয়াবুন্নাছারা বা খৃস্টানদের প্রশ্নোত্তর [১৩০৪/১৮৯৭, ২য় সংস্করণ ১৩১৫/১৯০৮] ইত্যাদি।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ আজকের দিনের লেখকের মত কেবল লেখার জন্যই লেখেননি। নাম জাহিরের কোনো খায়েশও তাঁর ছিল না কখনো। তিনি ছিলেন না প্রচলিত ধারার কোনো লেখক। তবু তাঁকে লিখতে হয়েছে। এক রকম বাধ্য হয়েই তিনি কলম ধরেছিলেন।

চারদিকে তখন চলছে খৃস্টানদের উৎপাত। চলছে তাদের অপপ্রচার আর অপতৎপরতা। এসব কাজের জন্য তারা মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিল বক্তৃতা-ভাষণ, সংবাদপত্র, বইপুস্তক এবং ব্যাপক লেখা-লেখি।

www.pathagar.com

সুতরাং তাদেরকে মুকাবিলা করতে হলে তো সেইসব মাধ্যমেরই প্রয়োজন হয়।

ঠিক এরকম চেতনা থেকেই মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর লেখালেখি শুরু।

তিনি কলম ধরেছিলেন জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে। দুঃসময়, খুবই দুঃসময় চলছে তখন মুসলমানদের।

বাংলার মুসলমানদের জাগানোর জন্যে বক্তৃতা এবং লেখা– এদুটোর কোনো বিকল্প তখন ছিল না।

খুবই সতর্ক ছিলেন মেহেরউল্লাহ। সতর্ক ছিলেন বলেই তাঁর সেই যৎসামান্য শক্তি আর সামর্থ্য দিয়ে লিখে এই জাতি ও সমাজকে দায়বদ্ধ করে গেছেন।

সত্যিই অতুলনীয় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ!

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক সওয়াল-জওয়াব

জন জমিরুদ্দীন ছিলেন প্রথম দিকে পাদ্রী। সে কথা তো আমরা আগেই জেনেছি।

এই জমিরুদ্দীন এক সময়, পাদ্রী থাকাকালীন অবস্থায় তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন মুনশী মেহেরউল্লাহর সাথে।

তর্কতো নয়, যুক্তির যুদ্ধ।

সেটা ছিল যুক্তির সাথে প্রমাণেরও ব্যাপার।

জমিরুদ্দীন ছিলেন পণ্ডিত মানুষ।

কিন্তু তার সেই পাণ্ডিত্যও হার মানলো মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর যুক্তি, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার কাছে। হার মানলেন জমিরুদ্দীন। ঘোরতর প্রতিপক্ষ সেই জন জমিরুদ্দীনই এক সময় ইসলাম কবুল করে হয়ে গেলেন মেহেরউল্লাহর একান্ত আপন বন্ধু। হলেন তাঁর নিত্য সহচর।

কিন্তু জমিরুদ্দীনের সেইসব প্রশ্ন এবং বিতর্ক এখনও ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে। আর সেই সাথে রয়ে গেছে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর সেই কালজয়ী ঐতিহাসিক জওয়াবও।

খুবই শাণিত জবাব ছিল মেহেরউল্লাহর।

তাঁর এই জওয়াবের মধ্যে কেবল একটি কালেরই চিত্র নেই, আছে মেহেরউল্লাহর অসাধারণ মেধা এবং জ্ঞানের স্বাক্ষরও।

বিষয়টির সাথে আমাদেরও পরিচিত হওয়া জরুরী বলে সেই সওয়াল-জওয়াবের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

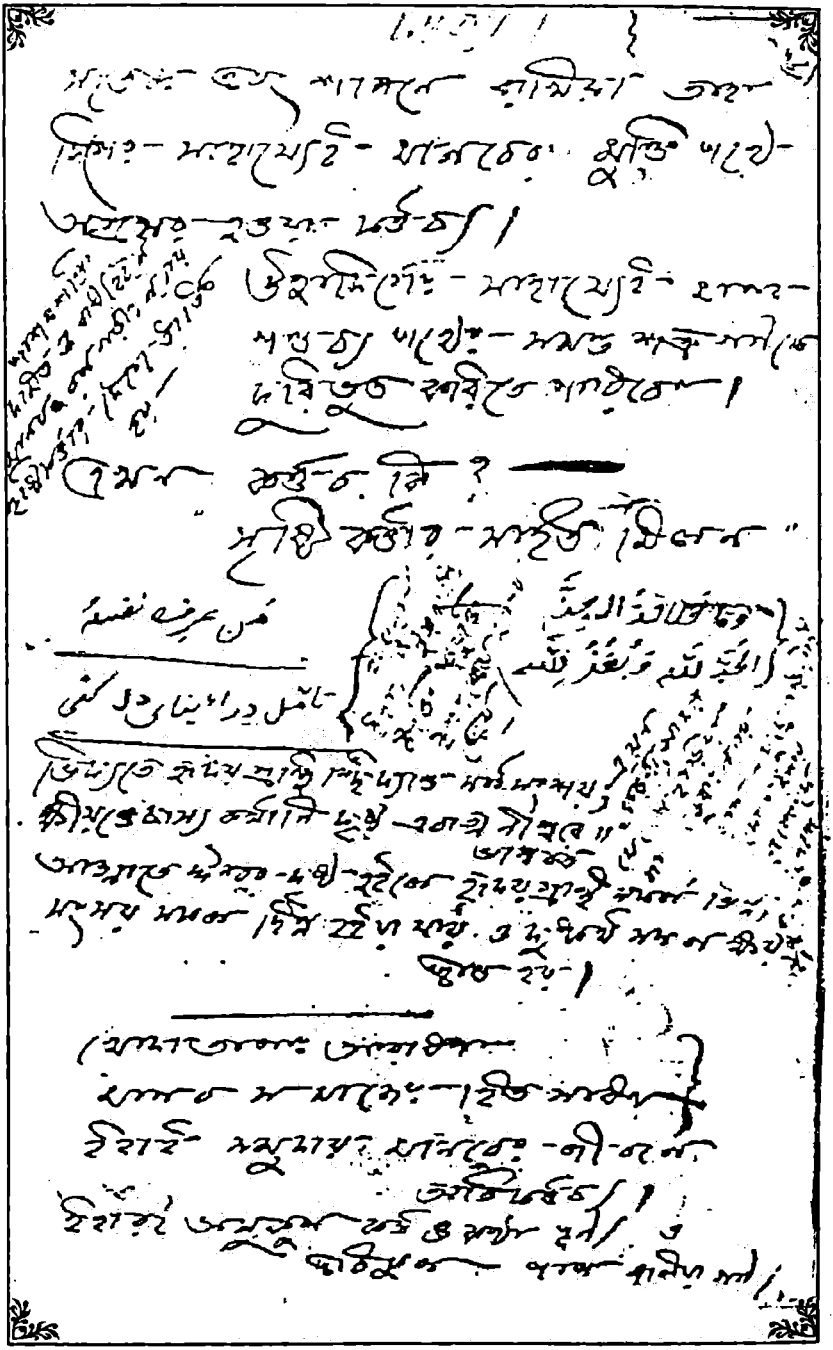

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর হস্তলিপি

www.pathagar.com

পাদ্রী জন জমিরুদ্দীনের সওয়াব

ক. আসল কোরান কোথায়?

আমরা যখন মুসলমানদের নিকট সুসমাচার প্রচার করি, তখন অনেক মুসলমানই কহিয়া থাকেন যে, "আপনাদের ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। খোদা তায়ালা মোহাম্মদ (দঃ)-এর উপর যাহা নাজেল করিয়াছিলেন অদ্যাপি অবিকল তাহাই রহিয়াছে।" আমাদের ধর্মশাস্ত্র যে কখন পরিবর্তিত হয় নাই, একথা মুসলমানদিগকে অনেক পুস্তকে লিখিয়াছি।... যিনি মুসলমান শাস্ত্রে অজ্ঞ, তিনিই বলেন যে, কোরান কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের হস্তে এখন আসল কোরান নাই।

১. কোরান মোহাম্মদ (দঃ)-এর সময় একত্র সংগৃহীত হয় নাই। দেখ– 'তিরমিযী; সুন্নী মুসলমানদের হাদীস।

২. মোহাম্মদ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর খলিফা আবু বকর (রাজিঃ) যায়েদ দ্বারা কোরান শরীফের সূরাগুলি একত্র এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেখ– 'বুখারী' গ্রন্থে।

৩. ওসমান (রাজিঃ) দুইবার কোরান দগ্ধ করেন। দেখ– 'মেশকাত উল মাশাবী'।

৪. শিয়া সম্প্রদায় কহিতেছেন যে কোরানে আলীর (রাজিঃ) এবং তাঁহার বংশের মাহাত্ম্যের বিষয় অনেক কথা ছিল। কিন্তু... ওসমান (রাজিঃ) তাহা কুরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। দেখ– "নহল আল বালাগাত" এবং শিয়াদিগের হাদীস। কলিকাতা, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভারতের নানা নগরে শিয়াগণ বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা কর।

৫. ইমাম জাফর কহিতেছেন যে, সূরা আহজাবে কোরেশের স্ত্রী ও পুরুষের ভ্রষ্টতার বিষয় বর্ণিত ছিল; ঐ সূরাটি সূরা বকর হইতে বড়। দেখ "আইনুল হক" গ্রন্থের দুই শত আট ওরকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা। আনিস এবনে মালিক কহিতেছেন, যখন আম্মি'নিয়ার সূরীয় দেশের লোকদিগের সহিত আজারবিজান ইরাক লোকদিগের যুদ্ধ হইতেছিল,

www.pathagar.com

তখন হাফিজা এবনে ইমাম ওসমানের (রাজিঃ) নিকট আসিয়া কোরান পাঠকের পাঠে অমিল হইবে এরূপ ভয় করিয়া কহিল, –হে বিশ্বাসী লোকের পথপ্রদর্শক, শিষ্যদিগের তথ্য লউন। পাছে তাহারা ইহুদী ও নাসারাদিগের ন্যায় শাস্ত্রে গোলযোগ উৎপন্ন করে। তাহাতে ওসমান (রাজিঃ) হাফিজার [মোহাম্মদ (দঃ)-এর স্ত্রী] নিকট লোক প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে, তুমি কোরানের হস্তলিপিখানি আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। আমরা নকল করিয়া ইহা তোমার নিকট পুনরায় পাঠাইয়া দিব। তখন ওসমান (রাজিঃ) সৈয়দ এবনে শাবিৎ, আবদুল্লা এবনে জবির এবং হারিৎ এবনে ইমাম এই তিনজনকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা উহা নকল কর। তাহারা উহা নকল করিলেন। আর ওসমান (রাজিঃ) উক্ত তিনজনকে কহিলেন, যখন তোমাদের ও জয়েদের কুরআনের সঙ্গে পরস্পর অমিল হইবে, তখন তাহা কোরেশের ভাষায় লিখিও। কারণ কোরান এই ভাষায় নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা ঠিক সেইরূপ করিলেন। খাতাটি নকল হইয়া গেলে, ওসমান (রাজিঃ) পুনরায় তাহা জয়েদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আর যাহা লেখা হইল, তাহার এক একখানি প্রতিলিপি নানা প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং পূর্বকার যত খাতা ছিল, তাহা দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। দেখ– "বুখারী" সুন্নীদিগের হাদীস গ্রন্থ।

৬. সকল মুসলমানই জানেন যে, মোহাম্মদ (দাঃ) স্বয়ং নিরক্ষর অর্থাৎ বিদ্যাহীন লোক ছিলেন। উক্ত আছে যে, যখন কোরানের আয়েত... মোহাম্মদ (দাঃ) এর উপর নাজেল হইত, তখন হাফেজেরা তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিত। আবার কখন কখন চর্মে, খোরমাপত্র প্রভৃতি বস্তুতে লিখিয়া একটি বাক্সেতে ফেলিয়া রাখা হইত। যাহা লিখিত হইত তাহা মুখস্থ হইত না। আবার যাহা মুখস্থ হইত তাহা লিখিত হইত না। এই প্রকারে ২৩ বৎসর মধ্যে কোরান নাজেল শেষ হয়। সকলেই জানেন, মুখস্ত করা অনেক সময় বেঠিক হইয়া থাকে। হাফেজেরা ভুল করিলে মোহাম্মদ (দাঃ) এর ধরিবার সাধ্য ছিল না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে নিশ্চয় আসল কোরান এখন নাই। এখনকার মুসলমানদিগের হস্তে যাহা

www.pathagar.com

আছে, তাহা নকল এবং সংশোধিত কোরান। আমরা এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র এবং "খ্রীষ্টীয় বান্ধব" সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ এই, "প্রবন্ধটি যেন অতিশয় দীর্ঘ না হয়।" অতএব আমরা এখন মুসলমানদিগের নিকট উক্ত ছয়টি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নিঃসন্দেহে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আপনাদিগের আসল কোরান শরীফ কোথায়?

মাদরাসায়ে ইলমে ইলাহী — শ্রী জন জমিরুদ্দীন শেখ

এলাহাবাদ ৪-৪-৯২

◆ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কিছু ছাপাখানা জনিত ভুল ছিল। জমিরুদ্দীন সাহেব পরে তা সংশোধন করে দেন। এখানে সংশোধিত পাঠ দেওয়া গেল। যেমন– তাতে "মিশকাত উল মশাবী" স্থানে 'মিশকাত উলমাবি' 'তিরমি'জি স্থলে 'তিমি'ক্তি' এবং নাহল আল বালাগাত স্থলে 'নহল আল বিলায়েত' ছিল।

মুনশী মেহেরউল্লাহর জওয়াব

সর্বত্রই আসল কোরান

[ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন]

[সুধাকর সম্পাদকের প্রতি।]

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও মহামান্য সম্পাদক সাহেব। নিম্নোক্ত বিষয়টি আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করতঃ বিজাতীয় আক্রমণের প্রতিকার ও ইসলাম সমাজের ব্যথিত-হৃদয় আনন্দিত করিবেন। বিষয়টি এই :

বিগত ১৮৯২ সালের জুন মাসের খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রিকার ১৩০ পৃষ্ঠায় 'আসল কোরান কোথায়'? শীর্ষক ধোকাপূর্ণ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার লেখক জন জমিরুদ্দীন শেখ মহাশয় পাদ্রী ফান্ডার কৃত মিজানুল হক (উর্দু) ও পাদ্রী আমানুদ্দীন প্রণীত তালিমে মোহাম্মদী (উর্দু) এবং পাদ্রী য্যাকব কাস্তিনাথ বিশ্বাস কৃত 'এসলাম দর্শন' (বাঙ্গালা) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহের আশ্রয় লইয়া সংশয়শূন্য মহা কোরানের প্রতি অযথা আক্রমণ ও বক্রোক্তি করিয়া বোধ করি ইসাই সমাজের 'ট্যাংরা বাবুদের' নিকট অগণ্য ধন্যবাদও পাইয়াছেন। তিনি উক্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থদ্বয় পাঠে ঈদৃশ চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন যে, ইসাই শাস্ত্রের সত্যতা ও ইসলাম শাস্ত্রের অসত্যতা প্রমাণ দর্শাইবার জন্যই সমুদয় মুসলমান ভাইকেও ঐ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা বলি, ভায়া! ইহার অনেকদিন পূর্বে মুসলমানগণ উহা পাঠ করিয়াছেন। যেদিন খৃষ্টানদিগের তর্ক বাগিশ মুরুব্বী ফান্ডার সাহেব মিজানুল হক জনসমাজে প্রকাশ করিলেন, তাহার পরদিনই তো মুসলমান ধর্মবীর স্বর্গীয় মাওলানা রহমতুল্লাহ মরহুম উহার দান্দান-শেকেন্ত (রদ্দে মিজান উল মিজান এজাযে ইছুবি নামক গ্রন্থদ্বয়) প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও ফান্ডার সাহেব, অনেকদিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করিতেও পাদ্রী সাহেবের শক্তি অপারগ ছিল। পাদ্রী আমান উদ্দীন ও তৎপ্রণীত তালিমে মোহাম্মদী জন সাহেবের দ্বিতীয় আশ্রয়। কিন্তু কানপুর নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব কর্তৃক তাহার পুস্তকের যে কঠোর প্রতিবাদ হইয়াছে, শেখজীর নজরে তাহা কি (সিরাতুল একিন নামক গ্রন্থখানি) আজিও পড়ে নাই? যদিও বঙ্গীয় মুসলমানদিগের কাপুরুষতা ও নির্জীবতা হেতু পাদ্রী য্যাকব কান্তিনাথ বিশ্বাস কৃত ইসলাম দর্শনের প্রতিবাদ বঙ্গভাষায় আজিও সম্পাদিত হয় নাই, তথাপি উর্দু ও পার্সি ভাষাতে উহার শত শত প্রতিবাদ পুস্তক বর্তমান এবং যেদিন তাহা বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইবে, খোদা চাহেত সেদিন অতি নিকটবর্তী। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম দর্শনে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা পাদ্রী ফান্ডার সাহেব রচিত গ্রন্থসমূহে মুদ্রিত করেন নাই এবং পাদ্রী ফান্ডারের এমন কোন প্রশ্ন নাই ধর্ম বীর মাওলানা রহমত উল্লাহ সাহেব যাহার যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত ৪০টি করিয়া উত্তর না লিখিয়াছেন।

খ্রীষ্টভক্ত শেখ মহাশয় জগতের যাবতীয় কোরান বিশ্বাসী মুসলমানকে অজ্ঞ ও মূর্খ বলিতে কসুর করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন– 'যিনি মুসলমান শাস্ত্রে অজ্ঞ তিনিই বলেন যে কোরান কখনও পরিবর্তিত হয় নাই।' আহা! খ্রীষ্টভক্তের কি অদ্ভূত শিক্ষা। নৈলে কি মহাশয়ের এত অভিজ্ঞতা? হায়! যে মহা কোরান বিমলালোকে আজ ভূমণ্ডল আলোকময়, খ্রীষ্ট শিষ্যের চক্ষে তাহা অন্ধকার, কেন? সে দোষ কার?

www.pathagar.com

ঐ যে চর্ম্মচটিকা দিবসে দেখিতে পায় না, সে জন্য সূর্যের কোন অপরাধ নাই। ইসাই ভাষার ও প্রকার বাকচাতুর্যে আমাদের মনঃক্ষুণ্ন হইবার ত কোনই কারণ নাই। কেননা তাহাদের ধর্মশাস্ত্র বাইবেলে যখন সেই জগৎকারণ করুণাময় বিশ্বপতি খোদা তায়ালার প্রতি প্রলাপ, অজ্ঞ দুর্বল নাদান এবং কমজোরী শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে (বাইবেল ১ম কর পুস্তক অধ্যায় ২৫ দেখ) তখন উক্ত শাস্ত্রধারিগণ সেই খোদাপ্রেমিক মুসলমানগণকে অজ্ঞ বলিবেন না কেন? যাক সেকথা এখন ইসাই ভায়া কান্ডারী ফান্ডারী ফান্ড হইতে যে ৬টি ধোকা নকল করিয়া আবার সদর্পে উহার উত্তরপ্রার্থী হইয়াছেন– পাঠক, কিঞ্চিৎ ধীর চিত্তে তাহার বাদ-প্রতিবাদ বিচার করুন।

প্রথম তিনটি ধোকার উত্তর

প্রথম তিনটা প্রমাণ দ্বারা খৃষ্টান বন্ধুর কোন বাসনা পূর্ণ হইল, তাহা বুঝিলাম না। আমরাও স্বীকার করি, হজরতের বর্তমানে মহা কোরানের লিখিত অংশগুলি একত্রে সংগৃহীত হয় নাই, সমুদয় কোরান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে লেখা ছিল। কিন্তু মহা কোরানের কোন একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে হজরত স্বয়ং সহস্রাধিক হাফেজ (কোরান কণ্ঠস্থকারী) প্রস্তুত করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। শেখজী দ্বিতীয় ধোকাতে বোখারী হাদীস শরীফের নাম করিয়া উহার অর্থ প্রকাশের বেলায় ঘোমটার তলে মুখ লুকাইয়াছেন, নতুবা বিজ্ঞ পাঠকবর্গ শেখজীর নিজের লেখাতেই মহা কুরআনের আসলত্বের প্রমাণ পাইতেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে জন সাহেবের মানিত হাদীছটির মর্ম প্রকাশ করিতেছি– খলিফা আবু বকরের (রাজিঃ) শাসনকালে যখন এমামার জেহাদে (ধর্ম সংগ্রামে) বহুতর কোরানের হাফেজ ধর্ম্মার্থে পঞ্চত্ব পাইতেছিলেন, সেই সময় মহাপুরুষ হজরত আবু বকর (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ) একত্রে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, যদি অন্যান্য যুদ্ধে এই প্রকার হাফেজ শহীদ হন ও দেশ হাফেজশূন্য হয়, তবে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ কোরানের কোন অংশ

www.pathagar.com

গোলমাল হইলেও হইতে পারে, অতএব যাহাতে ঈদৃশ আশংকা কোন সময়েই না থাকে, এখনই তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

(এই পরামর্শানুযায়ী) তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে সুলেখক জায়েদকে আহ্বান করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খোরমাপত্র ইত্যাদিতে লিখিত সূরাগুলি উদ্ধৃত ও হাফেজদিগের দ্বারা উহা শৃংখলাবদ্ধ করাইলেন। (বুখারী গ্রন্থ)

প্রিয় পাঠক! খৃষ্টান সাহেবের মানিত হাদীছটিই কোরানের আসলত্বের পাকা প্রমাণ কিনা বিচার করুন। মহা কোরানকে অক্ষুণ্ন রাখিতে মুসলমান খলিফাগণ কতদূর তৎপর ছিলেন, উক্ত হাদীছটি তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

তৃতীয় ধোকায় ইসাই সাহেব ওসমানের (রাজিঃ) "কোরান দগ্ধ" "কোরান দগ্ধ" করিয়া হঠাৎ "মিশকাতুল মাবি" এই একটি উৎকট উৎভঙ্গি ও স্বীয় গৃহগঠিত নামের আবিষ্কার করিয়া ভয়ানক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা, আজিও ইসলাম জগতে উক্ত নামে কোন গ্রন্থ নাই, তবে "মিশকাতল মসাবি" নামক হাদীছ শরীফ আছে। স্বয়ং সর্বশক্তিমান খোদা তায়ালা যখন স্বীয় উক্তিতে বলিয়াছেন যে, আমিই কোরানের সংরক্ষক (সূরা হিজর : ৯ আয়াত) তখন কোন মানুষের শক্তি যে সেই কোরানকে দগ্ধ করিতে পারে? হজরত ওসমান (রাজিঃ) কি দগ্ধ করিয়াছে তাহাও পাঠক শুনুন।

যে কোন কাগজ বা বৃক্ষপত্র হউক, যাহাতেই কোরানের আয়াত বা খোদা তায়ালার নামাংকিত থাকে উহাকে যথোচিত সম্মান করা শাস্ত্রের দৃঢ় আদেশ; তাই যখন হজরত ওসমান (রাজিঃ) দেখিলেন যে কোরানের বহুতর আয়াত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোরমা পত্রাদিতে লিখিত আছে এবং সমুদয় কোরানও শৃংখলাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ভাবিলেন যে ঐ ক্ষুদ্র পত্রগুলির আর আবশ্যকতা নাই এবং পত্রগুলি সাবধানে রাখাও দুরূহ। কোনক্রমে যদি এগুলি কোন কদর্য স্থানে পড়িয়া বিনষ্ট হয়, তাহাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ; সুতরাং পত্রগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিলে আর সে আশংকা থাকিবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেই পত্রগুলি দগ্ধ করিবার আদেশ দেন। (মিশকাতুল মসাবি); এখন কোরান দগ্ধ না, খৃষ্ট ভক্তের দু'কাল দগ্ধ হইল, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের বিচারাধীন।

www.pathagar.com

শেখজীর চতুর্থ ধোকার উত্তর

১. খ্রীষ্টভক্তকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেননা, ঝটাপট একটা 'হটাতল হাদীছের' নামাবিষ্কার করা অভিজ্ঞতার লক্ষণ। শিয়াদিগের মধ্যে উক্ত নামের কোন গ্রন্থই নাই, জন সাহেব যখন সেই নামটি আবিষ্কারক, তখন তিনি অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

২. শিয়াদিগের কোন প্রামাণিক পুস্তকেই হজরত ওসমানের (রাজি)ঃ প্রতি "কাফের" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই এবং আজিও কোন শিক্ষিত শিয়ার মুখ হইতে ঈদৃশ কুৎসিত বাক্য নির্গত হয় নাই। তবে যদি ভায়া কোনদিন কোন ষণ্ডা-গুন্ডা শিয়ার মুখে এরূপ শুনিয়া থাকেন তবে প্রটেষ্ট্যান্ট গুরু পাদ্রী লুথারের প্রতি রোমানমণ্ডলীর সুধামাখা বোলগুলির স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের রোমান খৃষ্টানদিগের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এক বাক্যে বলিবেন যে, পাদ্রী লুথার ও প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানগণ বাইবেলের অনেক অংশ বাদ দিয়াছেন।

৩. হজরত ওসমান (রাজিঃ) সম্বন্ধে শিয়াদিগের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই কাফের শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; বরং তাহার প্রতি শিয়াদিগের শিরোধার্য ও সর্ব্বপ্রধান হেঞ্জাল বালাগুতাহ নামক গ্রন্থে কি লিখিত আছে তাহা দেখ– "খোদা তায়ালার অনুগ্রহ বর্ত্তৃক হজরত ওসমান (রাজিঃ) ও হজরত ওমরের (রাজিঃ) প্রতি কেননা নিশ্চয়ই তাহারা বক্রপথের পথিকদিগকে সোজা ও সরল পথের পান্থ করিয়াছেন এবং কুসংস্কারসমূহকে সমূলে উচ্ছেদ করতঃ সুসংস্কার ও দীনে মোহাম্মদী বা সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "কাশফুল গামতাহ" নামক গ্রন্থখানিতেও মহাপুরুষ ওসমান (রাজিঃ) সম্বন্ধে ঐ প্রকার বর্ণিত আছে। শিয়াদিগের শিরোধার্য গ্রন্থসমূহে যখন মহাত্ম্য ওসমানের (রাজিঃ) প্রতি ঈদৃশ মাহাত্ম্যপূর্ণ রচনাবলী বর্তমান, তখন সেই শিয়াদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া যদি কেহ হযরত ওসমান (রাজিঃ) কে দোষী করিতে চান, সেটা তাহার বাতুলতা বা সারশূন্য ধোকা বই আর কি?

www.pathagar.com

জন সাহেবের ৫ম ধোকা

"এমাম জাফর কহিতেছেন যে, সূরা আহযাবে কোরেশের পুরুষ ও স্ত্রীদিগের ভ্রষ্টতার বিষয় বর্ণিত ছিল। এই সূরাটি বকর হইতে বড়।" দেখ– আয়ন-উল-হক গ্রন্থের ২০৮ ওরক।"

উত্তর

১. 'আয়নুল হক' গ্রন্থে ঈদৃশ কোন কথা লেখা নাই। জনৈক বিকৃতমনা শিয়া 'আয়নুল হায়াত' নামক একখানি খামখেয়ালী পুস্তকে এরূপ ভিত্তি ও প্রমাণশূন্য কয়েকটি প্রলাপোক্তি করিয়াছিল সত্য; কিন্তু উক্ত পুস্তক প্রকাশ হওয়া মাত্রই যে স্বয়ং শিয়া পন্ডিতগণই উহার কঠোর প্রতিবাদ ও সেই ভণ্ড শিয়াটিকে সম্পূর্ণ প্রতারক নির্দেশ করিয়াছিলেন, শেখ মহাশয় কি তাহা কখনও শোনেন নাই?

২. কোরান সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, প্রামাণিক হাদীছ বিরুদ্ধ হইলেই তাহা অগ্রাহ্য; সুতরাং আয়নুল হায়াত প্রণেতা যখন হাদীছ হইতে কোনই প্রমাণ দিতে পারেন নাই তখন তাহার কথা বাতুলতা মাত্র।

৩. আবু জাফর সাহেব কখনই ঐ কথা বলেন নাই, উহা সম্পূর্ণ সেই ভণ্ড শিয়াটির প্রতারণা; আবু জাফর সাহেবের স্বরচিত গ্রন্থই এ বিষয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

'এৎক্বাদাৎ' নামক যে গ্রন্থখানি আজিও শিয়া সম্প্রদায়ের শিরোধার্য সেই গ্রন্থে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে "কোরানের প্রতি আমার বিশ্বাস এইরূপ– আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রেরিত হজরত মোহাম্মদের (দাঃ) প্রতি যে কোরান অবতীর্ণ (নাজিল) করিয়াছেন, তাহা দুইটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে (লিখিত ও কণ্ঠস্থ) বর্তমান লোকদিগের নিকট পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী নয়। কিন্তু অন্যের নিকট সূরা আলাম নাশরা ও আদ্দোহা পৃথক পৃথক দুইটি সূরা। উহা আমার বিবেচনায় (উভয় মিলিয়া) একটি সূরা। এতদ্ভিন্ন যে কেহ আমার সম্বন্ধে বলে যে, আমি বলি, কুরআনে ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল, সে প্রকাশ্য প্রতারক।" আবু জাফর প্রণীত 'এতক্বাদাৎ' গ্রন্থ।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক, যে আবু জাফর সাহেব বর্তমান কোরানের একটি অক্ষর বা আকার-একারেরও কমবেশী স্বীকার করেন নাই, সেই মহাপুরুষের মাথায় এত বড় দোষ চাপাইয়া যাহারা সুপথগামীকে বিপথগামী করিতে নিয়ত চেষ্টিত, তাহারা কোন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তাহার মীমাংসা আপনারাই করুন। ধোকাবাজ খৃষ্টানগণ কোরানের বিরুদ্ধে বক্তৃতাকালে সর্বদাই শিয়াদিগের মাথায় ভর দিয়া নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। এ জন্য সৈয়দ মরতজা নামক একজন প্রবীণ শিয়া পণ্ডিতের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শিয়াদিগের শিরোধার্য "জামেউল বয়ান" নামক গ্রন্থে উক্ত মহাত্ম্য লিখিয়াছেন– "নিশ্চয়ই কোরানের এলম একটি আশ্চর্যের বিষয়; নিশ্চয়ই আরবীয় ওলামাগণ (পণ্ডিতমণ্ডলী) স্বীয় শাস্ত্র মহা কোরানকে পৃথিবীতে অক্ষুণ্ন সর্ব্বোন্নত স্থানের অধিকারী। যেহেতু কোরান প্রেরিতত্ত্বের (নবুয়তের) একটি পূর্ণ মোজেজা (নিদর্শন), সুতরাং কোরান শরীফই ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, ঐহিক এবং পারমার্থিক বিষয়ক শিক্ষার মূল। মুসলিম ওলামাগণ কোরানকে ঈদৃশ অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, উহার একটি জের জবরেরও (আকার-একার) পরিবর্তন হয় নাই।" প্রিয় ইসাই, দেখুন, আপনাদের মানিত সাক্ষী শিয়া পণ্ডিতের মুখেই কোরানের অকৃত্রিমতার কি সুন্দর প্রমাণ হইল। এক্ষণেও কি আপনাদের সেই অসার স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে না?

পঞ্চম প্রশ্নে জন সাহেব যে হাদীছটির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই কোরানের অপরিবর্তনীয়তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু জন সাহেব হাদীছটির অনুবাদে ঠিক তাহাদের বাইবেলের ন্যায় "মন পোলাও" পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। আমরা হাদীছটির যথার্থ অনুবাদ এখানে প্রকাশ করিতেছি :

মালেকের পুত্র আনেছ রওয়ায়েত করিতেছেন, যখন ইমানের পুত্র হোজায়ফা আর্মে'নিয়ার সূরিয়াবাসীদের এবং আজারবিজানে ইরাকী সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তিনি (ইমানের পুত্র হোজায়ফা) কোরান পাঠকের পাঠোচ্চারণে অমিল হইবে এই আশংকায় হজরত ওসমানের (রাজিঃ) নিকট আসিয়া কহিলেন, "হে আমিরুল মুমেনিন, ইহুদী ও ইসায়ীদিগের বাইবেলের ন্যায় মুসলমান শাস্ত্রে

www.pathagar.com

(কোরান) গোলযোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে মুসলিম শিষ্যগণের তত্ত্ব লউন। তখন হজরত ওসমান হাফিজার (রাজিঃ) নিকট লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি (কোরানের) হস্তলিপি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা উহা উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। হজরত হাফিজা (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ হস্তলিপিটি পাঠাইয়া দিলেন। তখন হজরত ওসমান (রাজিঃ) সাবেতের পুত্র জয়েদ, জাবিরের পুত্র আবদুল্লাহ্ এই চারিজনকে তাহা নকল করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু আদেশকালে বলিলেন– যখন তোমাদের সহিত (অন্য স্থানের ও বংশের) জয়েদের কোরানের শব্দোচ্চারণের অনৈক্য হয়, তখন তাহা কোরেশের ভাষায় উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিও। কারণ কোরান শরীফ কোরেশের ভাষায় নাজিল হইয়াছে।

পরে তাহাদের লেখা শেষ হইলে হজরত ওসমান (রাজিঃ) হস্তলিপিটি হাফিজার (রাজিঃ) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আর ঐরূপ এক এক খণ্ড কুরআন লেখাইয়া প্রত্যেক দেশে প্রেরণ করিলেন। আর যে সমস্ত সহিফা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাদিতে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা ছিল, তাহা দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন (দেখ মিশকাত ও বোখারী)।

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীছটির মূল তত্ত্ব– যাহা পাদটীকায় লিখিত হইল, কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে গভীর চিত্তে পাঠ করুন; দেখিবেন মূল কোরানের ইহাই আসলত্বের প্রমাণ।

৬ষ্ঠ ধোকার উত্তর

হজরত মোহাম্মদ (দা) সাধারণ বিদ্যায় নিরক্ষর ছিলেন এ কথা সত্য। ইহা তাঁহার প্রেরিতত্ত্বের বা নবুয়তের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা স্বীকার করি, তিনি কোন মানুষের নিকট কোনদিন কোন বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু সেই নিরক্ষর মহাপুরুষের পবিত্র রসনাগ্র-নিঃসৃত অনন্ত জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত এবং ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ অলঙ্কারপূর্ণ বচনাবলীর নিকট যখন সমুদয় জগতের ভাষাবিদ বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিতমণ্ডলীকে অবনত মস্তক দেখি, তখন তিনি নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বোপরিস্থ মহামহিমের প্রদত্ত বচন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা স্থির নিশ্চয়।... হজরত খোদা

www.pathagar.com

তায়ালা প্রদত্ত আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎবাসীকে শিক্ষাদানে পূর্ণ শক্তিমান হইয়াছিলেন। কোরানের আয়াতসমূহ নাজেল হওয়া মাত্র তিনি স্বয়ং তৎসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক সাহাবীগণকে তাহা মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। আয়াতসমূহ কাহারো কাহারো তৎক্ষণাৎ মুখস্থ হইয়া যাইত; আর যাহাদের মুখস্থ করিতে বিলম্ব হইত, তাহারা তখন খোরমা পত্রাদিতে লিখিয়া লইতেন।

হাফেজগণ সমস্ত কোরান মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। "যাহা লিখিত হইত তাহা মুখস্থ হইত না, আর যাহা মুখস্থ হইত তাহা লিখিত হইত না," ইহা মিথ্যা কথা। দুই চারিজন হাফেজের মুখস্থ বিষয় বেঠিক হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে বিষয়টি সহস্র সহস্র লোকে তখনই মুখস্থ করিত, তাহা সকলেরই বেঠিক হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন হাফেজের কোরানের পাঠে ভুল হইলে হজরত নিজেই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। কারণ তিনি নিজেই হাফেজ ছিলেন। জন সাহেবকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন কোন এলাহাবাদী হাফেজের নিকট গিয়া কোরানের যে কোন স্থানের একটি পদ কেন, একটি আকার বা একার মাত্র ভুল করিয়া পরীক্ষা লন যে, হাফেজদিগের ভুল ধরিবার সাধ্য আছে কি না।

আশা করি, এখন বেশ বোঝা যাইতেছে যে, কোরানের আসলত্বে কোন প্রকারের কোন গোলমাল হয় নাই। আজ আমরা তর্করূপায়ণ প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সগর্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি যে, যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজপত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থা ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে। তাহার আসলত্বের বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি হইবে না। খৃষ্টীয়ান বন্ধুগণ, ধর্মতঃ বল দেখি, তোমরা বাইবেলের বলে এরূপ সাহস বাঁধিতে পার কি?

পাদ্রী সাহেবের জওয়াব

মুনশী সাহেবের উপরিউক্ত প্রবন্ধের জওয়াবে পাদ্রী সাহেব একটি

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সুধাকরে লেখেন (২৩ বৈশাখ, ১৩০০)। প্রবন্ধটি নিতান্তই মামুলী। তাতে নতুন কথা বিশেষ কিছু নেই। মনে হয়, নিহায়েত মুখ রক্ষার খাতিরে এই জওয়াব দেওয়া। সংক্ষেপে তার বক্তব্য এই–

"সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। প্রবন্ধ লেখক আমার লিখিত প্রবন্ধটির ঠিক মর্ম অবগত না হইয়া ও আমার লিখিত ছয়টি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া আমার প্রতি অনর্থক কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেটি ভালো কাজ করেন নাই।...

পরিশেষে লিখিতব্য এই যে, কোরান শরীফ যদি পরিবর্তিত না হইত, তবে শিয়া ও সুন্নীদিগের কোরান শরীফে পরস্পর মিল থাকিত। সুন্নী ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের কোরান শরীফের পরস্পর মিল নাই। শিয়াদিগের কোরানে যে সূরা আছে সুন্নীদিগের কোরানে সে সূরা নাই। যদি কোন মহাশয় উক্ত সূরা দেখিতে চান, তাহা হইল পাঞ্জাবস্থ অমৃতসরের পাদ্রী শ্রীযুক্ত রেভারেন্ড মৌলবী এমাদ উদ্দীন লাহিজ ডি, ডি, সাহেবের কৃত "তহকিকুল ইমান" নামক কেতাবের ৯ম পৃষ্ঠা হইতে ১১শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন। উক্ত কেতাব এলাহাবাদ ও লাহোর ট্রাক্ট সোসাইটিতে পাওয়া যায়। শিয়া সম্প্রদায় মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে যে সুন্নীদিগের কোরান তাহরিক (পরিবর্তন) হইয়াছে। ভাই মোহাম্মদী, আপনি অনুন্ধান করিয়া দেখুন, যাহা সম্পূর্ণ সত্য তাহা গ্রহণ করুন। তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।

শ্রী জন জমিরুদ্দীন
এলাহাবাদ

মুনশী সাহেবের জওয়াব

সর্ব্বত্রই আসল কুরআন

"খৃষ্টীয় বান্ধব" পত্রিকায় "আসল কোরান কোথায়?" শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমানদিগের নিকট কোরানের বিরুদ্ধে ছয়টি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সুধাকরে তাহার সমস্তগুলিরই ধারাবাহিক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদী সাহেব লিখিয়াছেন– "সুধাকরে ইসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা

www.pathagar.com

নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলাম। প্রবন্ধ লেখক আমার লিখিত প্রবন্ধের ঠিক মর্ম অবগত না হইয়া আমার প্রতি অনর্থক কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।"

জন সাহেবের ছয়টি প্রশ্নই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া পদে পদে প্রতিবাদ এবং তাহার মানিত হাদীছসমূহের দ্বারাই বর্তমান কোরানের আসলত্ব বা নির্ভুলতার প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। উত্তর লেখক তাহার কোন কথার ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই সে কথার আলোচনা না করিয়া "আমার প্রবন্ধের মর্ম্ম অবগত হন নাই, প্রকৃত উত্তর দেন নাই।" এবম্বিধ ভুয়া মন্তব্য ঝাড়া বা লক্ষ্যশূন্য উড়ো ফায়ার কি তাহার পক্ষে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কাজ হয় নাই? প্রশ্নকারী হাদীছগুলির উচ্চারণ দোষ না হয় কম্পোজিটারের মাথায় দিয়াই পার পাইলেন। কিন্তু আনেস বিন মালেক বর্ণিত হাদীছটির অনুবাদেও তিনি যে স্বরুচি মোতাবেক খিচুড়ি পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, সেটি কি তাহার হৃদযন্ত্রের জ্ঞান কম্পোজিটারের দোষ নয়? শেখজী বোধ হয় আমার ৪র্থ ও ৫ম প্রশ্নের উত্তর কয়টি পাঠ করেন নাই, তাহা না হইলে তিনি বারংবার সেই শিয়া কাহিনীই গাহিবেন কেন? তাহার মানিত শিয়াদিগের প্রমাণিত ও শিরোধার্য গ্রন্থসমূহের দ্বারাই ত প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্তমান কোরানই আসল কোরান।

প্রশ্নকারী শেখ মহাশয় ৪র্থ ও ৫ম প্রশ্নে শিয়াদিগের মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সূরাটি হজরত ওসমান (রাজিঃ) কোরান হইতে তুলিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা সূরা বকর হইতে বড়।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে সূরা বকরটি অন্যূন ৮০/৯০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কিন্তু প্রতিবাদী ২৩শে বৈশাখে সুধাকরে লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ শিয়াদিগের কোরানোক্ত সূরাটি দেখিতে চান, তবে পাদ্রী আমাদুদ্দীন কৃত "তহকিকুল ইমান" পুস্তকের ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠা দেখুন। আমরা বলি, সূরা বকর হইতে বড় সূরাটি অগত্যা শতাধিক পৃষ্ঠা চাই। সেই সূরাটি পাদ্রীজী নাকি ৯ হইতে ১১ অর্থাৎ ২/২ পৃষ্ঠায় সমাবেশ করিয়াছেন, একথার বুনিয়াদে কি পরিমাণ সত্যের সম্পর্ক আছে, তাহা আবার বুঝাইতে হইবে? ধোকা ইহারই নাম। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নকারী

www.pathagar.com

শেখজী পূর্বেই ৪র্থ ও ৫ম প্রশ্নে স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, হজরত ওসমান (রাজিঃ) তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দগ্ধীভূত সূরাটি পাদ্রীজী কোথায় পাইলেন?

তৃতীয়তঃ এই বিশাল বঙ্গদেশের নানাস্থানের অসংখ্য শিয়া ও শিয়াদিগের পাঠ্য কোরান বর্তমান থাকিতে সেই পাঞ্জাবস্থ জনৈক বিকৃতমনা ব্যক্তির কৃত পুস্তক যাহা সহজ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে, তার বরাত দিয়া শেখ মহাশয় ভাল করিয়াছেন কি? আমরা কিন্তু শিয়া সুন্নীদিগের সহস্র সহস্র পাঠ্য কোরান একত্র করিয়া তাহার অভিন্নতা দেখাইতে পারি। কিন্তু একটি শহরে যদি রোমান ও প্রটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টান থাকে, তবে তাহাদের দুই দলের বাইবেল লইয়া মিলাইয়া দেখিবেন যে, উভয় বাইবেলে সম্পূর্ণ অমিল হইবে। যিনি ল্যাটিন ভাষা না জানেন, তিনি যেন রোমান পাদ্রীকে একথা জিজ্ঞাসা করেন; দেখিবেন তিনি বলিবেন যে, "আমাদের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বাইবেল আজিও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই।" ইসাই বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের কোরান একত্র করিয়া পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখুন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। তাই বলি সর্বত্রই আসল কোরান।

মোহাম্মদ মেহেরউল্লা
যশোহর

পাদটীকা

১. এই ঘটনার পূর্বে যে কোরান শরীফের কোন অংশই গোলমাল হয় নাই, 'হইবে' আশঙ্কা দ্বারা তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। উক্ত যুদ্ধে বহুতর হাফেজকে শহিদ হইতে দেখিয়া হোজায়ফার মনে ঈদৃশ আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল।

২. ঊক্ত পদটির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে যে,এই সময়ের পূর্বেই

www.pathagar.com

বাইবেলে গোলযোগ হইয়াছিল। তদর্শনে মুসলমানগণ ভীত হইয়া ঈদৃশ দোষ স্পর্শ করিবার পূর্বেই মহা কোরানকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

৩. এই হস্তলিপিটি এখনও কাবাতে বর্তমান আছে। দাফেওল বেসাত গ্রন্থ দেখ।

৪. পাদ্রী সাহেব এই চারিটি নাম লিখিতেও খিচুড়ী পাকাইয়াছেন; বরং চারি স্থলে তিনজন বলিয়াই পালা শায় করিয়াছেন।

৫. জয়েদ ভিন্ন আর তিনজনেই কোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। এক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণে পার্থক্য হইয়া থাকে। জয়েদ উপযুক্ত শিক্ষিত এবং কোরেশ ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও কথার উচ্চারণে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল, তাহা স্বাভাবিক। লিখিত ভাষাতেও এইরূপ ভুল দেখা যায়। মহাপুরুষ ওসমান ইহা বিচেনা করিয়া যাহাতে কোরান ঈদৃশ বিকৃতভাবে উচ্চারিত কোন শব্দের সমাবেশ হইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কোরেশ বংশীয় উক্ত তিন ব্যক্তিকে পূর্বেই সতর্ক করয়া দিয়া বলিলেন যে, যদি তোমাদের তিনজনের সহিত জয়েদের উচ্চারণে কোন অনৈক্য হয়, তবে তাহা কোরেশের ভাষায় লিখিও। কারণ কোরান কোরেশ ভাষায় নাযিল হইয়াছে। এ স্থানে মাত্র উচ্চারণে অমিলের কথা বলা হইয়াছে। কোন শব্দ বা অধ্যায় বিষয়ক অমিলের কথা নহে।

মন্তব্য

পাদ্রী সাহেব এর পরে আর কোন জবাব দিতে পারেননি এবং অল্পদিন পরেই ইসলাম গ্রহণান্তর মুনশী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ নামে পরিচিত হন। বলা বাহুল্য, আরও পরে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর সহকারী ইসলাম প্রচারক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

কবিতার চমক

মুনশী মোহাম্মাদ মেহেরউল্লাহ যেমন যুক্তিনিষ্ঠ গদ্য লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন কবিতাও। তাঁর একটি কবিতার শিরোনাম– "খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা"। এখানেও লক্ষণীয় বিষয় যে, তিনি কেবল কবি-খ্যাতির জন্যেই কবিতা লেখেননি। তাঁর কবিতা লেখার উদ্দেশ্য জাতি, ধর্ম এবং মানবতা। 'রদ্দে খৃস্টান ও দলিলুল ইসলাম' থেকে তাঁর এই প্রাসঙ্গিক কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি :

শুন সত্যান্বেষী জন, কর সত্য অন্বেষণ;
অকারণ ত্যাজিও না, দুর্লভ নর-জীবন।
পাপামতি শয়তানে; ঘুরাইল নানা স্থানে,
ক্ষুধাতে কাতর যিনি, খোদা নহে কদাচন।
অতএব স্থির চিত্তে শুন খৃস্টায়ান;
যদি আশা থাকে মনে, পাইবারে ত্রাণ
অবিলম্বে ত্যজি সবে কল্পিত ঈশ্বর;
সত্য সনাতন ঈশে পূজ নিরন্তর।
নিশ্চয় অমর খোদা সত্য সনাতন;
ক্রুশে হত যীশু, খোদা, নহে কদাচন।
[এক] আল্লাহ বিনে আর, নাহি ত্রাণ হায়,
সেই নাম সার, করছেহ সুজন।

ওপরের কবিতাটির পরে এবার মেহেরউল্লাহর একটি অসাধারণ কবিতা– 'না'তিয়া'র কিছু অংশের সাথে আমরা পরিচিত হবো। এই

www.pathagar.com

না'তিয়াটি এখনও পর্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের মিলাদ মাহফিলে গাওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এতেই বুঝা যায় যে, এর জনপ্রিয়তা কি পরিমাণ। এই জনপ্রিয়, বহুল পঠিত কালজয়ী না'তিয়াটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

গাওরে মোসলেমগণ
নবী গুণ গাওরে।
পরাণ ভরিয়া সবে✳
ছাল্লে আলা গাওরে

আপনা কালামে নবীর ছালামে
তাকিদ করেন বারি ॥
কালেবেতে জান কহিতে জবান
যে এক থাকিতে জারি✳

যে বেশে যে ভাষে
যে দেশেতে যাওরে ॥
গাও গাও গাও সবে
ছাল্লে আলা গাওরে✳

হজরত আদম গোনাতে যে দশ
বেদম কান্দিয়া ছিল ॥
পাইল রেহাই মোস্তফা দোহাই
যেই দমে দিয়াছিল✳

তাই বলি পাপী
যদি পাপ ক্ষমা চাওরে ॥
ত্বরা করি প্রাণ ভরি
ছাল্লে আলা গাওরে✳

www.pathagar.com

নূহ পয়গম্বর হুকুমে আল্লার
জাহাজ বানান যবে ॥
উপরে তাঁহার নাম মোস্তফার
লিখিলে ভাসিল তবে✳

ভব পার যেতে যার
বাসনা সে আওরে ॥
হৃদয় জাহাজে লিখে
নবী নাম গাওরে✳

খলিলের পেশানীতে নবী নূর নেশানিতে
আলোকিত ছিল হায় ॥
আহা সেই নূর বলে নমরূদের মহানলে
খলিলুল্লাহ মুক্তি পায়✳

ওহে ভাই জাহান্নামে
যেতে যে না চাওরে ॥
আজীবন মন প্রাণে
নবী গুণ গাওরে✳

ফেরেস্তা সহিস হয়ে যাঁহার বোরাক লয়ে
আসিল এ দুনিয়ায় ॥
তিনি যে কেমন জন ভাবো হে ভাবুকগণ
তাঁহার মেছাল দিবাকার✳

www.pathagar.com

বোরাকে ছেরাত পার
যাইতে যে চাওরে ॥
বদন ভরিয়া সে
ছাল্লে আলা গাওরে

নিমেষে আরশে যায় বারিতালা দরগায়
ওম্মত নিস্তার তরে ॥
বান্দার নাজাত পথ নিত্য নিধি শরিয়ত
খতম তাঁহার পরে✳

নিমেষে চুলের পুল
যদি পার হওরে ॥
নবীজীর শরিয়ত
শিরে তুলে লওরে✳

আমরা মোসলেম দলে আহ কি কপাল ফলে
পাইয়াছি সে মাতিনে ॥
মুসা দাউদ ঈসা যে পাক চরণ আশা
রেখেছে নিদান দানে

এসে মোরা সে চরণ
শিরে তুলি লইরে ॥
দুখে সুখে মনে মুখে
ছাল্লে আলা কইরে✳

যে সময় ভব ঘোর হইল গোনায় পোর
এমন সময় বারি ॥

www.pathagar.com

মোস্তফা সুরুজে তবে উদয় করেন ভবে
করিতে আলোক জারি✳

উদিলে ইসলাম রবি
কাফেরি বিলয় রে ॥
বল সবে উচ্চ রবে
ছাল্লে আলা জয়রে✳

যত পীর ওলিগণ সেবি সে চরণ ধন
সাধনে পেয়েছে ফল ॥
সে পাক চরণ যারা ছাড়িল নাদান তারা
তারাই নিঃসম্বল✳

না চেয়ে পেয়েছ তাঁরে
আর কার চাওরে?
সে পাক চরণে সবে
হৃদে জাগা দাওরে✳

ইহুদী নাছারা দল হিন্দু শিখ এ সকল
ত্যাজিয়া আসল রব ॥
দেব-দেবী গাছ-পালা ঘাট মাঠ কাষ্ট শিলা–
তাহারা পূজিছে সব✳

সত্য রবে মোরা পেয়েছি
যে অছিলায় রে ॥
এক কোটি কণ্ঠে ভেজি
ছালাম তাঁহার রে✳

www.pathagar.com

নবীজীর ছানা যত লক্ষ মুখে অবিরত
কহিলেও হইবে না ॥
যাহার জবানে ভাই নবীর দরূদ নাই
সে নাজাত পাইবে না✳

অতএব সবে আখেরের
গান গাওরে ॥
নবী নামে ছাল্লে আলা
দমে দমে গাওরে✳

নবীজী সহায় যার ভয় কি মরতে তার?
সে জন পেয়ারা খোদা ॥
নবীর খেলাফ যারা খোদার দুশমন তারা
নরকে থাকিবে সদা✳

নবীজীর প্রেম-ডোরে
সবে শির দাওরে ॥
হৃদয় ভরিয়া সদা
ছাল্লে আলা গাওরে✳
এ অধীন জোড় করে চরণে বিনয় করে
হে মম দয়াল নবী ॥
গোনা মোর বড় দেখে ফেলনা চরণ থেকে
আর না লুকাও ছবি✳

রে পাপী, ও মূঢ় মন!
মোক্ষ যদি চাওরে ॥

www.pathagar.com

নবী পদ লক্ষ্য করি
ছাল্লে আলা গাওরে✳

মুনশী মোহাম্মাদ মেহেরউল্লাহর আর একটি জনপ্রিয় কবিতার নাম– 'আত্মোপদেশ'।

খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী এই কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি। এই কবিতাটিও তাঁর 'মেহেরুল এছলামে' আছে।

গেল এ চৌত্রিশ সাল
এখনও ছেলেমো হাল
গেল না ঘুমেই শুয়ে রলি,
জাগিয়া দেখরে এসে
পড়িয়াছ কোন দেশে
এ কোন শহর কোন গলি✳
চৌত্রিশ বৎসর আগে
ছিলি তুই কোন বাগে
কোন দেশ কোন শহরেতে✳

আজও গ্রাম-বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে, হাটে মাঠে উচ্চারিত হয় মেহেরউল্লাহর এই অসম্ভব জনপ্রিয় লাইনগুলো :

ভাবো মন দমে দম
রাহা দূর বেলা কম
ভূখ বেশী অতি কম খানা ॥
ছামনে দেখিতে পাই
পানি তোর তরে নাই
কিন্তু রে পিপাসা ষোল আনা✳
জ্বরেতে কাতর মন
দাওয়া চায় অনুক্ষণ
বল দাওয়া লইবা কি দিয়া ॥
পুঁজি পাট্টা যাহা ছিল

www.pathagar.com

ঠগে ঠকাইয়া নিল
খালি হাতে যাইবা কি লিয়া✳
হাতে নাই কানা কড়ি
না জানি যমের বেড়ি
কোন ঘড়ি লাগে এসে পায় ॥
থাকিলে এমনি বসে
সে জন বান্ধিবে কসে
বল কিসে বুঝাইবে তায়✳
দেখিয়া পরের বাড়ি
জামা জোড়া ঘোড়া গাড়ি
ঘড়ি ঘড়ি কত সাধ মনে ॥
ভুলেছ কালের তালি
ভুলেছ বাঁশের চালি
ভুলিয়াছ কবর ছামনে✳
✳ ✳ ✳ ✳
ভবের বাজার এই
হেন দেশ আর নেই
পায় পায় ফেরে ঠগী দল ॥
পাইলে বিদেশী নরে
ভুলায়ে বে-রাহা করে
লুঠে তারে করে নিঃসম্বল✳
হয়ে তুই দিকহারা
বসিয়া কাটালি সারা
বেলা কিন্তু বেশী নাহি আর ॥
ডুবিলে হায়াত বেলা
যাবে তোর ধূলা খেলা
ভাঙ্গিবে এ ভবের বাজার✳

www.pathagar.com

নিদারুণ এক দণ্ডের করাত

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। প্রথমটির নাম– 'বিধবা গঞ্জনা'। আর দ্বিতীয়টি হলো– 'হিন্দু ধর্ম রহস্য।' কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, গ্রন্থ দুটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল প্রকাশের বহু পরে।

'বিধবা গঞ্জনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সনে। মেহেরউল্লাহর জীবদ্দশায় এর সংস্করণ প্রকাশিত হয় পাঁচটি।

আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে! পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯০৯ সনে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ– 'হিন্দু ধর্ম রহস্য'-এর ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ব্যাপার ঘটে।

এই গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হয় ছয়টি। মেহেরউল্লাহর জীবদ্দশাতেই। এটাও বাজেয়াপ্ত হয় ১৯০৯ সনে।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ইন্তেকাল করেন ১৯০৭ সনে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরে গ্রন্থ দুটি বাজেয়াপ্ত হয়।

কম কথা নয়, সেই সময়ে কোনো গ্রন্থের পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একটা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে গ্রন্থ দুটি কি বিপুল পরিমাণ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

আফসোসের বিষয়, মেহেরউল্লাহর ইন্তেকালের দুই বছর পর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' যখন তাঁর পুত্র মনসুর আহমদ সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন এটি বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত হবার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়– গ্রন্থটি অশ্লীলতা ও পর-ধর্মের প্রতি আক্রমণের দায়ে দুষ্ট। আর

www.pathagar.com

এই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের দায়ে শাস্তি হিসাবে মেহেরউল্লাহর নাবালক পুত্র মনসুর আহমদকে দুশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের জেল হয়।

শত চেষ্টা ও শত অনুরোধেও মেহেরউল্লাহর নাবালক পুত্র এই গুরু শাস্তি থেকে মুক্তি পাননি। গ্রাহ্য হয়নি সেদিন কোনো আবেদন নিবেদন।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর গ্রন্থ প্রকাশের দায়ে তাঁর নাবালক পুত্র মনসুর আহমদের বিচারে শাস্তি হয়। তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি লাঘবের জন্য আবেদন করা হলে বিচারপতি সে আবেদনও খারিজ করে দেন। এখানে সেই রায়টি তুলে ধরছি।

মূল রায় :

The appeallant has been convicted under section 293 I.P.C. in respect of two books called 'Hindu Dharma Rahashya O Deb-Lila' and 'Bidhaba Ganjana O Bishad Bhander', and has been Sentenced to pay a fine of Rupees two hundred only.

I have been invited by the learned pleader for the appeallant to consider whether the books are obcene or not. I must express my surprise at this invitation. One has only to read the books to see at once what faulty obcene libels they are– especially the book called 'Bidbaba Ganjana'. It has been argued the book Hindu Dharma Rahashya is a book of religious controversy, and that only incidents mentioned in the Hindu scripture have been quoted. As regards the books being one for the procecution of a religious controversy, the preface alone shows that it is nothing of the kind, and the author's intention was more to retaliate against the Hindus for supposed insults to Mahamadans by Hindu authors. However, that may, any book which conducts a religious controversy by compiling a series of obsene passages from the scriptures of the another religion is clearly an obsene publication. As regard the other book Bidhaba Ganjana

www.pathagar.com

most of the grossest obsenities it contains have little or no bearing on the question of the stensible subject,– the desirability of the re-marriege of widows. The whole matter has been very foolly dealt with in the able Judgement of the court below, and I need not add to what it contains that the accused had them in his possession for the purpose of sale is an admitted fact.

It has however, been argued the sentence is too severe, as the accused is a mere youth and was only selling books which have been unwritten and left by his father. I find however that only one of the two books was written by his father and that the accused himself has published both. (See the title pages of the books.)

In these circumstances, I am inclined to think that the accussed has been rather leniantly dealt with than otherwise. The appeal is dismised.

Jessore — Sd/L. Palit
20.7.09. — Session Judge

তরজমা

"হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' নামক গ্রন্থ প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় আপিলকারী মনসুর আহমদের দুশো টাকা জরিমানা হয়েছে।

বিজ্ঞ উকিল সাহেব গ্রন্থ দুটির অশ্লীলতা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আমি এতে আশ্চর্য বোধ করছি। বিশেষ করে 'বিধবা গঞ্জনা' বইটির ওপর একটু চোখ বুলালেই যে কেউ তার অশ্লীলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত করা হয়েছে যে, বইটি ধর্মীয় বিতর্কমূলক এবং বইতে শুধুমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করা হয়েছে। আসলে ব্যাপার কিন্তু তা নয়। তার ভূমিকাগুলি পড়লেই বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। আসলে

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের অনুমিত মুসলিম-বিদ্বেষের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে লেখকের এ প্রয়াস। অবশ্য তা হতে পারে, তবে অন্য ধর্মের শাস্ত্র থেকে অশ্লীলতাযুক্ত অংশ ক্রমাগত উদ্ধৃতি দিয়ে বিতর্ক উপস্থিত করাও অশ্লীলতা-দোষযুক্ত প্রকাশনা। আর 'বিধবা গঞ্জনা' বইটি বিধবা হওয়া না হওয়া সম্পর্কে রচিত হলেও অত্যন্ত জঘন্য বই। সমগ্র ব্যাপারটিই জঘন্যভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক যে সুচিন্তিত রায় দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার আর যোগ করার কিছুই নাই। কারণ, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে এগুলো বিক্রির জন্যই সংগ্রহ করেছে, তাতে তো সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই!

অবশ্য এমন তর্কও উপস্থাপিত হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিতান্তই তরুণ এবং বইগুলোও তার পিতার রচনা; এই বিবেচনায় তার শাস্তি একটু গুরুতর বিবেচিত হচ্ছে।

আমি দেখছি দুটি বইয়ের একটি মাত্র তার পিতার রচনা, অথচ দুটিই তার প্রকাশনা [দেখুন উভয় গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা]।

এই প্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতরই হয়েছে তাই আপিলের আবেদন অগ্রাহ্য করা গেল।

যশোর — স্বা/এল. পালিত

২০/৭/০৯ — সেশন জজ।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে [প্রকাশকাল ১৯৩৪, কলকাতা] এই মামলার রায় সম্পর্কে বলেন :

"মুনশী সাহেবের জীবিতাবস্থায় এই পুস্তকখানির অন্যূন ৮/১০ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কেহই উল্লিখিত পুস্তক দু'খানির বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। মরহুমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার এতিম বালকপুত্রগণের ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা পরিচালিত করা হইয়াছিল। মুনশী সাহেবের ব্যক্তিত্ব কত অসাধারণ ছিল, পরে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত এই দুইখানি পুস্তক জীবিতকালে অনুমান ৮/১০

www.pathagar.com

বৎসরের মধ্যেও অভিযুক্ত না হওয়ায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

মামলার রায়ে 'অশ্লীলতা' এবং 'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে'র অভিযোগ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের স্পষ্ট অভিমত হলো :

"হিন্দুগণ কর্তৃক লিখিত প্রায় সমস্ত বাংলা পুস্তকেই মুসলমান ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের তীব্র হলাহল উদ্গীরিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরে আঘাত না লাগিলে অপরের শরীরের আঘাতেও যে সে বেদনা পায়, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। তাই হিন্দু শাস্ত্রের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই সত্য শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পুস্তকখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে লিখিত হিন্দুগণের পুস্তকগুলো এখনও পর্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। তৎসমুদয় প্রতিরোধের তেমন চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পতিত জীবন্মৃত জাতির ইহা একটি জ্বলন্ত পরিচয়।"

সত্যি বলতে, মেহেরউল্লাহর গ্রন্থের প্রতি এই নিদারুণ দণ্ডের করাত ছিল অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুর এবং অমানবিক। উদ্দেশ্যমূলক তো বটেই।

অথচ, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন আকাশের মত উদার। ছিলো তার সমুদ্রের মত বিশাল একটি হৃদয়। সেই হৃদয়ে কখনো বাসা বাঁধতে পারেনি কোনো হিংসা, কোনো পরশ্রীকাতরতা, লোভ কিংবা সংকীর্ণতা।

দুঃখের বিষয়, এমন একটি উজ্জ্বল, সরল-সহজ মানুষকেও সহ্য করতে পারেনি তখনকার একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ।

কম বেদনার কথা নয়!

www.pathagar.com

খড়ের নিচে হীরকখণ্ড

ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ?

না, তাঁর জীবনে ছিল না কোনো জাকজমক কিংবা আড়ম্বর।

খুব সাধারণ, খুব সাদামাঠা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন।

মুসাফিরের হালতে চলতেন সর্বক্ষণ। তাঁর পুত্র তাঁকে, মেহেরউল্লাহর এই অতি সাধারণ জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। সেই সাথে তাঁর বন্ধুরাও। সেইসব বন্ধুর মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ জমিরুদ্দীন। তাঁর মুখ থেকেই শুনা যাক মেহেরউল্লাহর সেই আলোকিত জীবন সম্পর্কে। তিনি বলছেন :

"মুনশী সাহেব শত সহস্র টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। অথচ তিনি অপব্যয়ও করেন নাই। তিনি পীড়িত অবস্থায় অর্থ-কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। মুনশী সাহেব সামান্য পোশাক পরিতেন ও সামান্য আহার করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নতুন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলুভাতে ভাত চাই, গোশ্‌ত আমরা খাই না। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন; কখনও কাহারও মনোকষ্ট দিতেন না। তিনি সদা প্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও কোন বিষয় তাঁহার নিকটে প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, ছোট হইতে চেষ্টা করিতেন। নামাযে ইমাম হইবার জন্য আদৌ পা বাড়াইতেন না। তাঁহার বসতবাটী আড়ম্বরপূর্ণ নহে, সামান্য কয়েকখানি পর্ণ কুটীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! বিলাসিতাকে

www.pathagar.com

তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। তিনি শিক্ষক না হইয়া প্রায় ছাত্র হইতে চেষ্টা করিতেন। অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রীপুর বশীভূত ছিলেন না। বৃদ্ধা জননীকে তিনি বড়ই ভক্তি করিতেন, কখনো তাঁহার অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করিতেন না।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন দীনহীন মানুষ। তাঁর জীবন ছিল ইসলামের রঙে রঙিন।

যার জীবনের লক্ষ্যই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর কি পার্থিব সম্পদ কিংবা সম্ভোগের প্রতি কোনো লোভ থাকে? থাকতে পারে না।

মেহেরউল্লাহরও ছিল না। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নও জমিরুদ্দীনের মত একই রকম সাক্ষ্য দিচ্ছেন মেহেরউল্লাহর জীবন সম্পর্কে। তিনি বলছেন :

"তিনি [মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ] যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে অগাধ সম্পত্তি, বিপুল ধন-দৌলত সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই সৎকার্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়ার জন্য তিনি নিয়মিতভাবে এই অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ছাত্রগণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেন শিক্ষাপথে অগ্রসর হয়। তাঁহার বাটীতে বহু ছাত্রের জায়গীর ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার মত দেশ বিখ্যাত ব্যক্তির যশোহর টাউনের নিকটস্থ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বের বাটীতে অতিথি ও মেহমানের কখনও অভাব হইত না।... এই সমস্ত কারণে তাঁহার তৃণাচ্ছাদিত চালাগৃহ সমুন্নত অট্টালিকায় পরিণত হয় নাই, কিন্তু সেই খড়ের চালের ভিতর হইতেই যেন বেহেস্তের হীরক-রত্ন খচিত সুরম্য অট্টালিকার গৌরব-মহিমা ফুটিয়া উঠিত।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

ঠিক যেন মহামূল্যবান এক হীরক খণ্ড। খড়ের নিচে জ্বলতো সারাক্ষণ। সত্যিই তাই। অবিশ্বাস্য এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি।

কেন নয়? মেহেরউল্লাহ নিজেই তো ছিলেন হীরক রত্নের চাইতেও

www.pathagar.com

অনেক-অনেক দামি। ছিলেন নিঃস্বার্থ এক সোনার মানুষ। ধন নয়, যশ নয়, খ্যাতি নয়, কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্যই কাজ করে গেছেন সারাটি জীবন। আল্লাহর ওয়াস্তে। মানুষের কাছ থেকে কোনো বিনিময় তাঁর কাম্যও ছিল না।

তিনি কি কেবল মুসলমানেরই বন্ধু ছিলেন? না। তিনি জাতি ধর্মভেদে সকল মানুষের বন্ধু ছিলেন। ছিলেন একান্ত আপন জন। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত দরদ আর ভালবাসা।

মানুষের সেবা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ। একটি নজির দেয়া যাক।

একদিনের ঘটনা।

যশোর বাজারে এক অন্ধ ব্যক্তি তামাক বেচতো। ঘর থেকে গুড় মিশিয়ে তামাকের তাল পাকিয়ে, ছোট ছোট গুটি করে অল্পদামে সে বিক্রি করতো।

লোকটি ছিল অন্ধ। কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্যে সে দোকানে একটি কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে রাখতো। একদিন কোনো এক দুষ্ট চোর তার বাতিটা চুরি করে নিয়ে গেল। অন্ধ লোকটি বাতিটা জন্যে কেঁদে উঠলো।

বাজারের লোকজন দাঁড়িয়ে অন্ধ লোকটির তামাশা দেখছে। কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বললো, ইস! অন্ধের আবার বাতি!

এই সময়ে, ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। অন্ধের কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁরও প্রাণটা কেঁদে উঠলো হু হু করে। তিনি দ্রুত একটি নতুন বাতি কিনে আনলেন। তারপর নিজের কাপড় ছিঁড়ে একটি সলিতা পাকালেন। তারপর কেরোসিন ভরে বাতিটা জ্বালিয়ে তিনি অন্ধের হাতে দিলেন। বাতি পেয়ে সেই অন্ধের তখন কি যে আনন্দ!

অন্ধ লোকটি প্রাণ খুলে দোয়া করলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহকে।

আর একদিনের ঘটনা।

www.pathagar.com

একবার তাঁর গ্রামের একটি ছেলে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

চারপাশ থেকে ভেঙে এসেছে গ্রামের লোক। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা কেবল আহাজারি করছে ছেলেটির জন্যে। কিন্তু ছেলেটিকে ওঠানোর জন্যে কেউই চেষ্টা করছে না।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এবং তারপর।– তারপর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তিনি ঝাঁপ দিলেন কুয়োর ভেতর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুয়োর ভেতর থেকে তুলে আনলেন ছেলেটিকে।

এই ছিল মেহেরউল্লাহর ভালবাসা। মেহেরউল্লাহর মানবিক চরিত্র। কুয়োর ভেতর থেকে যেমন তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছেন একটি মরণাপন্ন ছেলেকে, ঠিক তেমনি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি উদ্ধার করেছেন একটি পতনোন্মুখ জাতিকে।

অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যে ছিল না তিল পরিমাণ কোনো ফাঁক। ছিল না স্ব-বিরোধিতা। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

জোছনার ছায়া নয়, গোলাপের ঘ্রাণ নয়, সমুদ্রের ফেনা নয়। বরং তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জোছনা, ছিলেন পরিস্ফুটিত গোলাপ এবং একটি সুবিশাল সমুদ্রের প্রতীক।

বস্তুত বিপুল বিস্ময়কর সমুদ্রই তো!

www.pathagar.com

ডুবিলে হায়াতের বেলা

"হয়ে তুই দিক হারা
বসিয়া কাটালি সারা
বেলা কিন্তু বেশী নাহি আর।
ডুবিলে হায়াতের বেলা
যাবে তোর ধূলা খেলা
ভাঙ্গিবে এ ভবের বাজার ॥"

ওপরের মর্মস্পর্শী লাইনগুলো মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর। তাঁর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ 'মেহেরুল এছলামে' গ্রন্থিত কবিতার কয়েকটি লাইন তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন– এ জীবন ক্ষণস্থায়ী।

আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সময় শেষ হলেই তাকে চলে যেতে হবে।

যিনি এই হৃদয়বিদারক লাইনগুলো লিখেছেন, সেই মুনশী মেহেরউল্লাহও এক সময় চলে গেলেন। চলে গেলেন তাঁর চারপাশের অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে। সময়টা ছিল ১৯০৭/১৩১৪ সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। স্থান– তাঁরই অতি আপন ঠিকানা– যশোর, ছাতিয়ানতলার বাসভবন।

মেহেরউল্লাহ মৃত্যুর আগে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সেটা ছিল জলপাইগুড়ি সফরের সময়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি বাড়িতে ফেরেন। তাঁর নিত্য সহচর, বন্ধু শেখ জমিরুদ্দীন জানাচ্ছেন :

"তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছাতিয়ানতলায় গমন করি। যাইয়া দেখি যে তাঁহার আর

www.pathagar.com

সে শরীর নাই; কেবল অস্থিমাত্র শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে যাইয়া "আচ্ছালামো আলায়কুম" করিলাম। ইহার উত্তরে তিনি "আলায়কুম আচ্ছালাম" কহিলেন। পরে আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা কহিতে বলিলাম না। পরে আমি তাঁহার জন্য কলিকাতার মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি; কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন? রোগের ঔষধ আছে, কিন্তু মৃত্যুর ঔষধ নাই।"

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

জীবনের প্রথমকালটা বাদ দিলে খুব সামান্য সময় তিনি পেয়েছিলেন কাজের জন্যে। তাঁর কর্ম জীবন মাত্র আঠার বছরের। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে তিনি এত বেশি কাজ করেছেন, যা আমাদের ধারণারও বাইরে।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি মনে করতেন অত্যন্ত মূল্যবান। সেই মূল্যবান সম্পদ তিনি ব্যবহার করতেন সকল সময়। একটি মুহূর্তও তিনি অলসভাবে কাটিয়ে দেননি। সেই জন্যই তিনি এত কম সময়ে এত বেশি কাজ করতে পেরেছেন। পেরেছেন জীবনটাকে সফলভাবে গড়ে তুলতে।

সর্বদা কর্মমুখর ছিলেন মুনশী কর্মবীর মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ।

এই সোনার মানুষটি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন সারা বাংলায় নেমে এলো শোকের ছায়া।

ছল ছল করে উঠলো প্রকৃতির বুক।

চোখের পানিতে বুক ভাসালো অগণিত মানুষ।

কম কষ্টের কথা নয়!–

তারা হারিয়েছে তাদের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন অভিভাবক ও বন্ধুটিকে। সুতরাং শোক সাগরে তো বেদনার জোয়ার বইবেই।

www.pathagar.com

শোক সাগরের ঢেউ

"এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মৃত্যুতে সেদিন যে শোকের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, তার থেকে কিছুটা এখন তুলে ধরা যাক। এসব থেকেই আমরা জানতে পারবো, মেহেরউল্লাহর কতটা পরিচিতি, খ্যাতি এবং কি অপরিসীম জনপ্রিয়তা ছিল। প্রথমেই আসা যাক তখনকার পত্র-পত্রিকার ভাষ্যে।

মিহির ও সুধাকর

"আজকাল বঙ্গীয় মোসলেম রাজনৈতিকগত ও ধর্মজগত ঘোর তমসাচ্ছন্ন। এই দুঃসময়ে যিনি উভয় বঙ্গের অস্বাস্থ্যকর স্থানে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অশিক্ষিত নিরীহ মুসলমানদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া শিক্ষা ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোযোগী হইবার জন্য উৎসাহ দিতে ছিলেন, যিনি আজ আঠার বৎসরকাল ধর্ম ও সমাজের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন, বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় বাগ্মী ইসলাম ধর্মপ্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ আর ইহজগতে নাই। মুসলমান জগতকে কাঁদাইয়া তিনি গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ৭ই জুন (২৪শে রবিউস সানী) শুক্রবার বেলা একটার সময় (ঠিক জুম্মা নামাজের সময়) পবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে...)।

তাঁহার মৃত্যুর অর্ধ ঘন্টা পূর্ব্বে হইতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল এবং প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল।

www.pathagar.com

ঐদিন দিনরাত্রির ভিতর রৌদ্র বা বৃষ্টি হয় নাই। এই সকল ঘটনা পরম্পরা ও মৃত্যুর পবিত্র সময় ইত্যাদি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একজন কিরূপ ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। বাস্তবিক মুনশী সাহেব একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি পরম ধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। শত শত নেড়ার ফকির ও অসংখ্য হিন্দু তাহার নিকট তওবা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। অনেক খৃষ্টিয়ানকে তিনি সদুপদেশ দ্বারা ইসলাম ধর্মে আনয়ন করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বেনামাজীকে তিনি নামাজে খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার জ্বলন্ত উপদেশে শত শত সহস্র লোক পাপ কার্য ছাড়িয়া ধর্ম পথের পান্থ হইয়াছেন। বহুলোক তাঁহার সাহায্যে ঋণ দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্মোপদেশে বহু সংখ্যক মসজেদ নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাব প্রবেশ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। বহু সংখ্যক সবল ও কর্মঠ ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীর দল পুষ্ট করিয়াছিল। এরূপ অসীম ক্ষমতাশালী বক্তা হিন্দু-সমাজেও দৃষ্ট হয় না। মুসলমান সমাজের দুর্গতির জ্বলন্ত চিত্র তিনি এমনি সজীবভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন যে, তদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের মারাত্মক রোগের বিষয়, অভাবের বিষয়, সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত। তাঁহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত লোকেরা মুগ্ধ হইতেন, সেইরূপে অন্যদিকে অশিক্ষিত জনসাধারণও উহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্ম-সংশোধনে প্রবৃত্ত হইত। তিনি পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায় বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি কোন ঘৃণিত রিপুরই তিনি বশীভূত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত

www.pathagar.com

মিষ্টভাষী ছিলেন; বক্তৃতা প্রসঙ্গে লোকের উপর কষাঘাত করিলেও লোকে তাহাতে বিরক্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা-সুধা পান করিত। দরিদ্রের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইত। পবিত্র ইসলাম ধর্মের আয়ত্তে থাকিয়া তিনি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার উদারতা দর্শনে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি মুসলমানদিগের জন্যই বঙ্গদেশে সুধাধারা ঢালিতেছিলেন। কিন্তু হায়, সকলই ফুরাইল।

ভাই বঙ্গীয় মুসলমান! আজ তোমরা প্রকৃত বন্ধু হারাইলে! আর কাহার বক্তৃতা-সুধা পান করিয়া তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে? আর কে তোমাদিগকে ওজস্বিনী ভাষায় পবিত্র ধর্মকথা শুনাইবে? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এক প্রকার বক্তাশূন্য হইল!"

ছোলতান

"বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। লেখনী আর অগ্রসর হয় না, স্মরতে প্রাণ শতধা ফাটিয়া যায়। হতভাগ্য সমাজের দূরদৃষ্টের কথা হৃদয়ে জাগ্রত হইলে প্রাণে প্রবল শোকস্রোত প্রবাহিত হয়। একি ভয়াবহ হৃদয়-বিদারক দুঃসংবাদ শুনিলাম! পতিত সমাজের উদ্ধারের আশা বুঝি ফুরাইল। সুষুপ্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বুঝি জাগিতে জাগিতে আর জাগিতে পারিল না। তাহারা বোধ হয় উন্নতি সোপানে উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিল না। আমাদের মহাপাপ নিবন্ধনই হয়ত খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে বাগ্মীকুল শিরোমণি স্বজাতিবৎসল, সমাজ হিতৈষী ধর্মগত প্রাণ, সমাজ-দেহের আত্মা-সদৃশ যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী ইসলাম প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব নিরাশ্রয় বঙ্গীয় পতিত মুসলমান সমাজকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ৭ই জুন শুক্রবার বেলা ১টার সময় অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে।"

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারক

"বঙ্গের সর্বপ্রধান বাগ্মী ও সমাজ সেবক, মুসলমানদিগের উন্নতির পথ-প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক মুসলমান কবি, গ্রন্থকার ও ধর্ম প্রচারক, সর্বজনপ্রিয় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার আশা নাই। আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, বাহু ভগ্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণ আর কাহার বক্তৃতার সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? কাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আত্মা চরিতার্থ করিবে? কাহার অমূল্য উপদেশমালা শ্রবণে সমাজ সেবায় গা ঢালিয়া দিবে? আমরা যে মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া পাইবার আশা নাই। মুনশী সাহেবের অভাবে বঙ্গীয় মোসলেম আকাশ যেন গভীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।"

মোসলেম সুহৃদ

"যিনি সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য দিন-রাত্রি চিন্তা করিয়াছেন, যাহার অনলময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান স্তম্ভিত হইয়াছেন, যাঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটায় মন-প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় ধমনীতে উৎসাহস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বক্তৃতা রাজ্যের প্রধান সম্রাট যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী সেই মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব আর ইহজগতে নাই।...

বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম ও রাজনীতিকগণ আজ ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। মুসলমান সমাজের এই ঘোর দুর্দিনে, তাঁহাদের উন্নতি-অবনতির এই সন্ধিস্থলে মুনশী মেহেরুল্লাহর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন উভয় বঙ্গের মুসলমান সমাজে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছিল, এই সময় দুরন্ত কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করিয়া প্রত্যেক মুসলমান সমাজ যে মূল্যবান রত্ন হারাইল, তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। অদ্য আমরা সাশ্রুনয়নে তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে

www.pathagar.com

বিদায় হইবার সময় বঙ্গের ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার নিকট করজোড়ে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, মুনশী সাহেবের সদগতির জন্য সকলেই যেন খোদা তা'লার নিকট প্রার্থনা করেন; সাধ্যমত দোয়া দরূদ পড়িয়া কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করিয়া উক্ত স্বর্গীয় নামের উপর বখশেশ করেন।"

এতো গেল পত্র-পত্রিকার কথা।

সেই সময়, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মৃত্যুতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সাথে কেঁদে উঠেছিল অনেক কবি-হৃদয়। তাঁদের সেইসব শোকসন্তপ্ত শব্দমালা এখনো জেগে আছে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ, কবি গোলাম হোসেন, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রমুখ। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মৃত্যুতে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছিলেন :

"একি অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকালো ছবি।
কি আর লিখিব কি আর বলিব আঁধার যে হেরি ধরা
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা।
কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জনে,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে
ছিন্ন হ'ল বিন কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্ব পাখী,
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে শুধু জলে ভাসে আঁখি।
কি লিখিব আর শুধু হাহাকার শুধু পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদনা রহিল জীবনে মোর।
মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগন হায়রে খসিয়া পল,
সুধা মন্দাকিনী জীবন-দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হল।
বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বিন

www.pathagar.com

প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।
মলয় পাবণ সুখ পরশন থামিল বসন্ত ভোরে
গোলাপ কুসুম চারু অনুপম প্রভাতে পড়িল ঝরে
ভবের সৌন্দর্য সৃষ্টির ঐশ্বর্য শারদের পূর্ণ শশী,
উদিতে উদিতে হাসিতে হাসিতে রাহুতে ফেলিল গ্রাসি।
জাগিতে জাগিতে উঠিতে উঠিতে নাহি হল দরশন,
এ বঙ্গ সমাজ সিন্ধুনীরে আজ হইলরে নিগমন।
এ পতিত জাতি আঁধারের রাতি পোহাবে চিরকাল,
হবে না উদ্ধার বুঝিলাম সার কাটিবে না মোহজাল।
সেই মহাজন করিয়া যতন অপূর্ব বাগ্মিতা বলে,
নিদ্রিত মোসলেমে ঘুরি, গ্রামে গ্রামে জাগাইয়া দলে দলে
যাঁর সাধনায় প্রতিভা-প্রভায় নতুন জীবন উষা,
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
আজি সে তপন হইল মগন অনন্তকালের তরে।
প্রবল আঁধার তাই একেবার আবরিছে চরাচরে।
বক্তৃতা তরঙ্গে এ বিশাল বঙ্গে ছুটিল জীবন ধারা,
মোসলেম বিদ্বেষী যত অবিশ্বাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারা।
হায়! হায়! হায়! হৃদি ফেটে যায় অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবারে গেল একেবারে আঁধারিয়া এ ভুবন।
কেহ না ভাবিল কেহ না বুঝিল কেমনে ডুবিল বেলা
ভাবিনি এমন হইবে ঘটন সবাই করিনু হেলা।
শেষ হল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি,
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসিগণ কি রতন গেল উঠি'।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময় অন্ধকার।"

[শোকাচ্ছ্বাস]

www.pathagar.com

কবি গোলাম হোসেন লিখেছিলেন :

[১]

হা মুসলিম বঙ্গবাসী চির ভাগ্য হীন,
জাগ ভেঙে ঘুম ঘোর দেখ চেয়ে মৃত্যু চোর
কি ধন করিল চুরি মুসলিম ভান্ডার,
আর কিহে সেই রত্ন পাবে বল আর?

[২]

বলিতে হৃদয় ফাটে ফেটে যায় বুক
বিষম মরম মাঝে দারুণ সে শেল বাজে
বহু নয় একমাত্র কাঙ্গালের নিধি
কি পাপে মোদের হায় কেড়ে নিল বিধি।

[৩]

একি দেখি কাল নিশা বাঙালায় আজি
উঠে হাহাকার রোল ছড়ায় আকাশ কোল
নাই সে মেহের আর এ শোকের ধ্বনি
ঘরে ঘরে বাঙলায় কি ঘোর রজনী।

[৪]

মুসলিম আকাশে হায় না ফুটিয়ে রবি
পূর্ণতেজে পুনরায় হঠাৎ ডুবিয়া যায়
আকাশে কুহার জালে অদৃশ্য অমনি
যে আঁধার সে আঁধার মুসলিম অবনী।

[৫]

বঙ্গের নিভৃত দূর যশোর বিপিণে
ফুটে এক বনফুল উজ্জ্বল মুসলিম কুল
অতুল সৌরভ তার সারা বঙ্গদেশ
বাগ্মিতায় যশ তার নাহি ছিল শেষ।

www.pathagar.com

[৬]

হায়রে মুসলিম ভাগ্য দারুণ এমনি
ঝরিল সে ফুল হায় কে আর তাহারে পায়
মুসলিম সমাজ আজ আবার উজাড়,
কীর্তিনাশা কূলে চির ভাঙনের পাড়।

[৭]

হা মেহের গেলে তুমি কাঁদাইয়া সবে
চলে গেলে বঙ্গ ছাড়ি বিধাতা নিলেন কাড়ি
কাঙ্গালের সবেধন তুমি 'নীলমণি'
তোমার ছাড়া আমাদের আঁধার অবনী।

[৮]

দু'দিন মিহির তেজে ধর্মের আকাশে,
উদয় হইল তব কি মহিমা কি গৌরব
আঁধার জ্বলিল কিবা আলোকে সে ভাতি
ভাবিলাম অবসান হ'ল, হ'ল দুঃখ রাতি।

[৯]

সহস্র রসনাতেজ দিল তোমা বিধি,
সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধার, তুলনা না ছিল তার,
প্রমাদ গণিল যত বিধর্মী কু'জন,
নোয়াইল মাথা শেষ করি পলায়ন।

[১০]

কাঁদিব না কেন মোরা তোমা হারা হয়ে?
আবার কি কোন কালে পাব মোরা ভাগ্য ফলে
ক্ষুরতেজ বাগ্মীবর সহস্র বয়ান,
তোমার মতন আর হেন ধর্ম প্রাণ?

www.pathagar.com

[১১]

হিন্দু শাস্ত্র সিন্দু তুমি করিয়া সন্ধান,
আগম পুরাণ বেদ রহস্য করিলে ভেদ,
প্রচারিলা দেবলীলা কুসংস্কার মূলে
অহিত বুঝিল হিন্দু তত্ত্বকথা ভুলে।

[১২]

হিন্দু বিধবার দুঃখে কাঁদে তব প্রাণ,
অবলা মরম-ব্যথা র চিলে দুঃখের গাথা
হিন্দুর পাষাণ প্রাণ না গলে তাহার
বুঝিল না সে কথা তব নিন্দা গায়।

[১৩]

গেলে ছাড়ি যাও সাথে, ভব কারাগারে
নশ্বর দুঃখের ধাম চিরজীবী রবে নাম
স্মৃতির পাষাণে আঁকা কীর্তি তব রবে,
হইবে না লোপ কভু মুছিবে না ভবে।

[১৪]

নহেই নিয়তি হয় দুঃখ চির সাথী
সহিয়াছ বহু ক্লেশ ভ্রমিয়াছ বহু দেশ
ভাগ্য ছিল অবশেষ মৃত্যু-পরবাসে,
পাও নাই দারাপুত্র কাহাকেও পাশে।

[১৫]

শেষের সে ঘোর দিনে পরাশ্রিত হয়ে
খোশ অন্তরঙ্গ যারা কেহ না হইল তারা
না জানি কাতর প্রাণ তাহাদের তরে
কাঁদিল নীরবে কত চক্ষে অশ্রু ঝরে।

www.pathagar.com

[১৬]

যাও সখে স্বর্গদ্বারে ওই হরি দল
তোমার ভেটিতে আসে যাও চলি স্বর্গবাসে
হাতেতে 'হায়াত আব' 'কওসরের জাম'
যাও সখে যাও সুখে সে সৌভাগ্য ধাম।"

[মেহেরউল্লাহ স্মরণে]

কবির কবরকে সামনে রেখে কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন 'নীরব সমাধি' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন–

"এই কি সে পুণ্যময় মোসলেমের তীর্থস্থান
যার নামে উঠে নাচি সবার মানস প্রাণ?
ছাতিয়ানতলা গ্রাম যশোহর জেলা মাঝে
এই কি সম্মুখে আজি শোভিছে অপূর্ব সাজে?
মোসলেম সমাজ জ্যোতি কোহিনূর মহামণি
জন্‌মিল এখানে কি? এই কি সে পুণ্য খনি?
নীরবে নিশীথে আজি নেহারি এ পুণ্যস্থান,
কত কত নবভাবে চমকিছে মন প্রাণ।
রজনী ত্রিযাম প্রায় ঘোর স্তব্ধ ভূ-মণ্ডল,
শান্তির সলিলে ধরা হইয়াছে সুশীতল।
আকাশে জাগিয়ে তারা হাসিছে নীরবে শশী,
প্রকৃতির গভীরতা পরানে যেতেছে বসি'।
সহসা-সহসা একি! এই কি সে গোরস্থান।
এই কি সে হায় মরি ভাবিতেও কাঁদে প্রাণ।
এখানে কি মেহেরুল্লাহ শায়িত আছেন হায়!
সমাজ সংস্কার ভুলি ভুলে গিয়ে সমুদয়।
হে মেহের বাঙ্গালার মোসলেম গৌরব-রবি,

www.pathagar.com

কেমনে ঘুমায়ে আছ এখানে ভুলিয়া সাধ?
তোমার অভাবে আজি চারিদিক অন্ধকার,
মোসলেমের ভাঙা প্রাণে উঠেতেছে হাহাকার।"

কবি ফজলল করিমের কবিতার চরণগুচ্ছ :

"তোমার বিপুল স্নেহ আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি' নব বল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।
আজি তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি?
০ ০ ০ ০ ০
অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মণি
খোয়াইনু মোরা। কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ কোহিনূর হতে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
রক্ষিবে মোসলেম কুল বক্ষের মাঝারে।'

কবি ফররুখ আহমদও বিস্মৃত হননি এই অসামান্য ব্যক্তিত্বকে। তিনি মেহেরউল্লাহর স্মরণে লিখেছেন 'জাতীয় জাগরণের অক্লান্ত সাধক' নামে একটি চমৎকার কবিতা :

"যে আত্মবিস্মৃত জাতি ভুলেছিল উত্তরাধিকার
নৈরাজ্যের অন্ধকারে পায়নি যে খুঁজে বুনিয়াদ,
অনুকারী মন যার পেয়েছিল তিক্ত বিসস্বাদ
[অজস্র লাঞ্ছনা আর অন্তহীন চিত্তের বিকার,
আত্মবিক্রয়ের মাঠে ঘৃণিত ভূমিকা দেখে তার]
তুমি উঠে এলে সেই ক্লান্তি-কীর্ণ জীবনের ভীড়ে,

www.pathagar.com

নিজেরে জ্বালায়ে তুমি তীব্র দ্যুতি জ্বালালে তিমিরে;
মর্দে মোমিনের স্বপ্ন গেল ছুঁয়ে রাত্রির কিনার।

তীব্র সংঘর্ষের মুখে দিলে তুমি যে আলো জাতিকে
দুর্দিনের অভিযাত্রী সে আলোকে পেল খুঁজে পথ
[হুসেনের অনুগামী পেল ফিরে হারানো হিম্মত
দিক্‌ভ্রষ্ট কারবালায় স্থির লক্ষ্য নিল তারা শিখে]
এখনো তোমার দৃষ্টি– সে বর্তিকা নিয়ে দিকে দিকে
চলেছে দুর্গম পথে অগণন নবীর উম্মত।"

[পাণ্ডুলিপি থেকে]

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর কবরের গায়ে প্রস্তর ফলকে লেখা আছে হৃদয়স্পর্শী চারটি চরণ :

"ভেবেছিল নিদ ঘুমন্ত জাতির যাহার প্রচার বাগ্মিতায়
কর্মবীর সেই আল্লার মেহের চির বিশ্রাম লভিছে হেথায়,
নায়েবে নবী, দ্বীনের হাদী বাগ্মী কুলতিলক
ইসলাম প্রচারক, স্বদেশ প্রেমিক, সমাজ সেবক।"

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

● মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর ১২৬৮/১৮৬১ জন্ম

১০ পৌষ/২৬ ডিসেম্বর মামার বাড়ি ঘোপ গ্রামে জন্ম। আব্বার নাম মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দীন। ছয়মাস বয়সে নিজ পৈত্রিক নিবাস ছাতিয়ানতলা গ্রামে মায়ের সাথে আসেন।

● ঐ একই সনের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

১২৭৩/১৮৬৬, বয়স-৫ বছর।

● পাঠশালায় ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণ পরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ সমাপ্ত এবং তৃতীয় পাঠ্যপুস্তক 'বোধোদয়' পাঠ শুরু। বোধোদয় পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই পিতা ওয়ারেস উদ্দীনের ইন্তেকাল। আপাততঃ শিক্ষাজীবন সমাপ্ত।

১২৮২/১৮৭৫, বয়স ১৪ বছর।

● খাজুরার নিকটবর্তী করচিয়া ও কয়ালখালী গ্রামে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মুন্‌শী মুহম্মদ ইসমাইল ও মুন্‌শী মেসবাহ উদ্দীনের নিকট তিন বছর আরবী ফারসী অধ্যয়ন করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে তাঁর মহীয়সী মাতার নিকট পবিত্র কুরআন, শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ, বুস্তা ও পান্দেনামা পাঠ করেন।

১২৮৫/১৮৭৮, বয়স-১৭ বছর।

● যশোর জেলা পরিষদে ছোট একটি চাকুরী গ্রহণ। স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে পরবর্তীতে চাকুরী ত্যাগ।

১২৮৭/১৮৮০, বয়স-১৯ বছর।

● দড়াটানায় দর্জির দোকান প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা শুরু।

● খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার ময়দানী জবাব শুরু।

www.pathagar.com

● সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম।

১২৯৩/১৮৮৬-, ২৫ বছর।

● 'খ্রীষ্টিয় ধর্মের অসারতা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।

● ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সমিতি, যশোর, গঠন।

১২৯৬/১৮৮৯, বয়স-২৮ বছর।

● চারণ কবি পাগলা কানাই-এর ইন্তেকাল, ২৮ আষাঢ় (বেড়াবাড়ী, ঝিনাইদহ, যশোর।), কবির মাজার জিয়ারত।

১২৯৭/১৮৯০, বয়স- ২৯ বছর।

● মরমী কবি লালন শাহের ইন্তেকাল।

১২৯৮/১৮৯১, বয়স-৩০ বছর।

● বরিশালের পিরোজপুরে মুসলমান খৃস্টান তর্কযুদ্ধে (আশ্বিন, ২১, ২২ ও ২৩), বিপক্ষে ছিলেন পাদরী ঈশান চন্দ্র মণ্ডল, পাদরী স্পার্জন ও পাদরী হাসান আলী। মুন্‌শী সাহেবের জয় লাভ।

১২৯৯/১৮৯২, বয়স-৩১ বছর।

● রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠক রত্নের সাথে কলম যুদ্ধের সূত্রপাত। পাদরী সাহেবের প্রবন্ধ, 'আসল কুরআন কোথায়?' মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ'র উত্তর 'সর্বত্রই আসল কুরআন।'

● দীর্ঘ কলম যুদ্ধের পর জন জমিরুদ্দীনের পরাস্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ।

১৩০০/১৮৯৩, বয়স-৩২ বছর।

● ১০ আষাঢ়, ১ম পুত্র আবুল মনসুর আহমদের জন্ম।

১৩০২/১৮৯৫, বয়স-৩৪ বছর।

● 'মেহেরুল এছলাম বা এছলাম রবি' কাব্য রচনা।

● 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান' প্রকাশ।

১৩০৪/১৮৯৭, বয়স-৩৬ বছর।

● 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার' কাব্য প্রকাশ।

১৩০৫/১৮৯৮, বয়স-৩৭ বছর।

www.pathagar.com

● ৩, ৪ ও ৫ ফাল্গুন নোয়াখালীর ঈদগাহ ময়দান, জুবিলি স্কুল ময়দানের জলসায় বক্তৃতা প্রদান।

● 'জওয়াবুন্নাছারা' প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা প্রকাশ।

● 'আখলাকে আহমদিয়া' [মুন্‌শী সাহেবের ওপর লেখা] নামক জনৈক ভক্তের লেখা পুস্তিকা প্রকাশ।

১৩০৬/১৮৯৯, বয়স-৩৮ বছর।

● পাবনা জেলার বড়ইবাড়ী হাটের জলসায় গিয়ে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ (কবি তখন একান্ত কিশোর)।

● খুলনার পায়গ্রাম কসবা, দৌলতপুর হাইস্কুলের জলসাসমূহে বক্তৃতা প্রদান।

১৩০৭/১৯০০, বয়স-৩৯ বছর।

● 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' প্রকাশ।

● নিজ খরচায় সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশ।

১৩০৮/১৯০১, বয়স-৪০ বছর।

● যশোর মনোহরপুর গ্রামে মাদ্‌রাসায়ে কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা। এই মাদ্‌রাসাটিই বর্তমানে মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ একাডেমী নামে পরিচিত।

● 'নূরুল ইসলাম' নামে মাদ্‌রাসায়ে কারামাতিয়ার দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।

● ২২ মাঘ বগুড়া টমসন হলে বক্তৃতা দান।

● ৪ ও ৫ আষাঢ় পাবনা টাউন হলে বক্তৃতা দান।

১৩১০/১৯০৩, বয়স-৪২ বছর।

● ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশনে যোগদান।

● এই সভায় মুন্‌শী সাহেব উত্থাপিত তৃতীয় প্রস্তাব, "এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান প্রয়োজন এবং প্রত্যেক এসলামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় ধর্ম্মশিক্ষা নিমিত্ত নির্ধারিত থাকা কর্ত্তব্য" পাস হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা

www.pathagar.com

হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী সৈয়দ শামসুল হোদা এম, এ, বি, এল (১৮৬২-১৯৯২)।

● ২৬ আশ্বিন, কনিষ্ঠ পুত্র মোখলেসুর রহমানের জন্ম।

১৩১১/১৯০৪, বয়স-৪৩।

● ২৬ আষাঢ় কুচবিহারের টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জলসায় বক্তৃতা দান।

● 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' পুস্তিকা রচনা।

১৩১২/১৯০৫, বয়স-৪৪ বছর।

● ৯ ও ১০ বৈশাখ, পশ্চিম গাঁও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের, দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৩১৩/১৯০৬, বয়স-৪৫ বছর।

● যশোহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (বর্তমান জেলা প্রশাসক) কর্তৃক তাঁর নিজ ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন।

● 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' পরবর্তীতে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'তে রূপান্তরিত হয় এবং এই সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় [১৯০৬ সালে] নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির একটি অধিবেশন হয়। উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

● ১৩১৪/১৯০৭, বয়স-৪৫ বছর।

● ২৪ ও ২৫ বৈশাখ উত্তর বঙ্গের মঙ্গল ঘাটের সভায় বক্তৃতা দান।

● ২৭ বৈশাখ রংপুরে এক সভায় বক্তৃতা দান।

● অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন।

● ২১ জ্যৈষ্ঠ ছাতিয়ানতলায় মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীনের আগমন ও বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা।

● ২৪ জ্যৈষ্ঠ কলকাতা থেকে মুসলমান ডাক্তার আনা হয়।

● ঐ দিন (শুক্রবার) বেলা ১টার সময় ইন্তেকাল।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ : দেশকাল সমাজ ॥ মুহাম্মদ আবূ তালিব

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ॥ আবুল হাসনাত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ॥ কাজী দীন মুহম্মদ

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ॥ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান ॥ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

ছোটদের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। ॥ দেওয়ান আবদুল হামিদ

ছোটদের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ॥ জোবেদ আলী

উপেক্ষিত সাহিত্য সাধক : সাতজন ॥ মুহম্মদ আবূ তালিব

রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম ॥ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার ॥ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

মেহেরুল এছলাম ॥ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা ॥ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

কর্মবীর মুনশী মেহেরউল্লাহ ॥ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ॥ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম

মুনশী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম ॥ সম্পাদনায়– নাসির হেলাল

মুনশী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী ১, ২ ॥ সম্পাদনায়– নাসির হেলাল

অগ্রপথিক

নতুন কলম

বিভিন্ন দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকী

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা